Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সিরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না আক্তার

রোলঃ 228020128

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সিরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না আক্তার

রোলঃ 228020128

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সিরাহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তামান্না আক্তার , আইডিঃ 228020128 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সিরাহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tamanna Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

তামান্না আক্তার

আইডিঃ 228020128

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা 5

নবীজি সাঃ এর জন্মের পূরবে কিছু ঘটনা 8

নবিজির বংশপরিচিতি, জন্ম ও শৈশব 11

নবীজি সাঃ এর দৈহিক অবয়ব,চরিত্র-বৈশিষ্ট্য... 19

নবীজির বিয়ে, নবুওয়াত প্রাপ্তি, গোপনে ও প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার 21

ইসরা ও মিরাজ.. 30

আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথ, নবীজি সাঃ এর মদিনায় হিযরত 31

বদর যুদ্ধের ঘটনাবলী 36

উহুদ যুদ্ধ ,খন্দক যুদ্ধ 42

হুদায়বিয়ার সন্ধি 44

মক্কা বিজয় 45

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ইন্তেকাল 47

ভুমিকা

আরবি ভাষায় সিরাহ বা **সিরাত** (আরবি : سيرة) **শব্দটি** sāra ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে, যার অর্থ "ভ্রমণ করা" বা "ভ্রমনে থাকা" ।একজন ব্যক্তির সিরাহ হল সেই ব্যক্তির জীবনযাত্রা, বা জীবনী , যা তার জন্ম, তাদের জীবনের ঘটনা, আচরণ এবং বৈশিষ্ট্য এবং তাদের মৃত্যুসহ সামগ্রিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।**সীরাহ** শব্দের আক্ষরিক **অর্থ** হলো পথ বা রাস্তা।
সিরাহ রচনা করার প্রধান দুটি উৎস হচ্ছে কোরআন ও হাদিস।

সিরাহ পড়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজন অপরিসীম।মুসলিম সমাজে যখন থেকে সাহিত্যচর্চা ও গ্রন্থ সংকলন শুরু হয়েছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য তাবেয়ি,তাবে তাবেয়িন,চার ইমাম, বরণ্য যুগের অসংখ্য উলামা একরাম থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অসংখ্য আলেমগন তাদের স্ব স্ব ভাষায় নবিজী সাঃ এর সিরাহ রচনা করেছেন।মুসলিম সমাজের লেখকগণই নবীজির সিরাহ রচনা করেননি বরং হাজার হাজার ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুশরিক তার জীবনি রচনা করেছেন।

ইউরোপীয় এক সিরাহ লেখক বলেন,মুহাম্মদের সাঃ জীবনী লেখকদের ধারা এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে শেষ হওয়ার মতো নয়। তবে নবীজির জীবনী লেখকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং এ মহৎ কাজে জড়িত হতে পারাও যে কারো গর্বের বিষয়।(**সিরাতুন নবী**)

বিশ্ব মানবতার নেতা দোজাহানের সরদার জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রথম প্রবেশকারী সেই মহা মানব মুহাম্মদ সাঃ এর সিরাহ পাঠ করা নিছক কোন বিষয় নয় বরং তা পাঠ করা আমাদের জন্য অত্যাবশকীয়।স্বয়ং আল্লাহ সরাসরি পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন

আল্লাহ বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।(সূরা আহযাব আয়াত নং ২১)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ‌ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِىۡ شَىۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ‌ؕ ذٰ لِكَ خَيۡرٌ وَّاَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا ٪

অর্থঃহে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।(সূরা আন-নিসা আয়াত নং ৫৯)

الَّذِىۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحۡىٖ وَيُمِيۡتُ‌ ۖ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِ النَّبِىِّ الۡاُمِّىِّ الَّذِىۡ يُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ‏

অর্থঃ(হে রাসূল! তাদেরকে) বল, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, ৮৬ যার আয়ত্তে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আন, যিনি উম্মী নবী এবং যিনি আল্লাহ ও তার বাণীসমূহে বিশ্বাস রাখেন এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।(সূরা আল আরাফ আয়াত নং ১৫৮)

রাসূল সাঃ সিরাহ পাঠ করলে আমরা জানতে পারবো তার জীবন কতটা বৈচিত্রময় ও ঘাতপ্রতিঘাত সম্পূর্ণ হওয়ার পরও তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে জীবন যাপন করেছেন।তিনি একদিকে যেমন বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন অন্যদিকে মদিনার শিশুদের সাথে খেলাধুলা করেছেন ঘুরেবেরিয়েছেন এবং মদিনার বিভিন্ন শিশুদের নামে কবিতা আবৃতি ও করেছেন। শিশুদের মুখের হাসির কারণ ছিল মুহাম্মদ সাঃ।তিনি একদিকে যেমন ছিলেন সর্বোওম নবী ও সর্বোত্তম মানুষ এবং অন্যদিকে ছিলেন সর্বোত্তম স্বামী ও বন্ধু।

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জীবন অধ্যয়ন করলে তা আমাদেরকে কোরআন বুঝতে সহায়তা করবে।সিরাহ অধ্যায়ন করলে আমরা জানতে পারবো যে সূরা আলে ইমরানর এর সংক্রান্ত আয়াতগুলি উহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে,সূরা আনফালের যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতগুলি বদর যুদ্ধের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, সূরা দুহা নাজিল হয়েছে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কাছে সাময়িকভাবে ওহী আসা বন্ধ থাকার প্রেক্ষিতে, সূরা আযহাবের অধিকাংশ আয়াত নাযিল হয়েছে খন্দকের যুদ্ধের প্রেক্ষিতে, নাযরন থেকে আগত একটি বড়সড় খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ এর কথোপকথনের সমর্থন যোগানোর জন্য সূরা আলে ইমরানের অনেকগুলি আয়াত নাযিল হয় ইত্যাদি।একমাত্র সিরাহ অধ্যায়ন করার মাধ্যমেই আয়াতগুলোকে যথাযথ পরিস্থিতির নিরিখে বোঝা সম্ভব।সিরাহ অধ্যায়ন করলে কোরআনের সাথে সাথে হাদিস বুঝতেও সহায়ক হয়। হাদীসের গ্রন্থগুলিতে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর জীবনের খন্ডিত ঘটনাবলির বর্ণিত রয়েছে। কয়েকটি হাদিস একত্র করে একটি ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়।তাই হাদিসের বিধিবিধান ও শিক্ষাকে উপলব্ধি করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সিরাহ এর উপর দখল করা জরুরী।**(IOM সিরাহ শীট)**

নবীজি সাঃ এর জন্মের পূরবে কিছু ঘটনা

জমজম কুপ পুনরুদ্ধার

জুরহুম গোত্রের লোকেরা মক্কা থেকে চলে যাওয়ার পর যমযম কুপ দীর্ঘ ৩০০ বছর বিলুপ্ত থাকে।আল্লাহ তা'য়ালা আব্দুল মুত্তালিব এর মাধ্যমে সেটি পুনরায় সকলের সামনে উন্মোচিত করেন।এক রাতে আব্দুল মুত্তালিব ঘুমিয়ে ছিলেন।সে সময় তিনি স্বপ্নে দেখলেন এক আগন্তুক তাকে বলছে খনন কর আব্দুল মুত্তালিব জিজ্ঞেস করলে কি খনন করব? কিন্তু আগন্তুক কোন জবাব না দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।পরদিন তিনি আবারও স্বপ্নে দেখলেন তাকে বলা হচ্ছে মাযনূনাহ খনন কর তিনি তখনও জিজ্ঞেস করলেন মযনূনাহ কি?আগন্তুক তখনও কোন উত্তর না দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।তৃতীয় দিন আব্দুল মুত্তালিব আবার স্বপ্নে দেখলেন তাকে বলা হচ্ছে তায়্যিবা খনন কর।তখন আব্দুল মুতালিব জিজ্ঞেস করলেন তায়্যিবা কি?কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারও তিনি কোন উত্তর পেলেন না।চতুর্থ দিন আব্দুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখলেন তাকে বলা হচ্ছে যমযম খনন কর।তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যমযম কি?আগন্তুক তাকে যমযমের পরিচয় এবং স্থান সম্পর্কে অবগত করলেন।পরদিন তিনি তার পুত্র হারিসকে নিয়ে স্বপ্নে দেখা তথ্য অনুযায়ী যমযম কুপ খুঁজে বের করলেন এবং বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে যমযম কূপের মালিকানা সহ মক্কার কুরাইশদের নেতৃত্ব লাভ করলেন।

আসহাবুল উখদুদ

ইয়ামানে এক ইহূদী রাজা ছিলো যার নাম যু-নাওয়াস।তার একজন উপদেষ্টা ছিলো যিনি হচ্ছেন একজন জাদুকর।উপদেষ্টা জাদুকরের অনেক বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি তার এক উত্তরসূরী মনোনীত করতে চাইলেন যাকে তিনি যাদুবিদ্যা শিখাবেন যেন তার মৃত্যুর পরে রাজাকে তার যাদুবিদ্যা দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতে পারে।তারা আব্দুল্লাহ ইবনে সামের নামে একজন বালককে উত্তরসূরী হিসেবে নির্বাচন করলো।সেই বালকটি প্রতিদিন জাদুকরের কাছ থেকে যাদুবিদ্যা শিখতে থাকে।এমনই একদিন সকালে বালকটি জাদুকরের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওনা হয় পথিমধ্যে তিনি একটি ইবাদত থানা দেখতে পেলেন যেখানে একজন যাজক প্রার্থনা করছিলো।বালকটি যাজক কে তার ধর্মের

ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে যাজক তাকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দেন।বালকটি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যাজক যে ধর্মের কথা বলছে সেটি সত্য।সত্য সম্পর্কের অবগত হওয়ার পর বালকটি যাজকের কাছে থেকে যেতে চাচ্ছিলো না কিন্তু তাকে তো পাঠানো হয়েছে জাদুকরের কাছে জাদু বিদ্যা অর্জনের জন্য।যাজক তাকে একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিলেন যেন প্রতিদিন সে যাজকের ইবাদত খানায় আসতে পারে।বলাকটি তার কোথা অনুযায়ী চলতে লাগলো এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে বালকটি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে উঠলেন।

আল্লাহ তার বান্দাদের পরীক্ষা করে থাকেন।আল্লাহর পরীক্ষা ছাড়া কোন বান্দাই আল্লাহর কাছে উন্নীত হতে পারে না।যেহেতু বালকটি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে উঠেছিল তাই তাকেও এখন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।

রাজা যু-নাওয়াস যখন জানতে পারলো বালকটি অন্য ধর্মের প্রতি ঈমান এনেছে তখন তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।রাজা বালকটিকে হত্যা করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে কিন্তু কিছুতেই বালকটিকে হত্যা করতে সক্ষম হচ্ছিলো না।কারণ তারা যখনই বালকটিকে হত্যা করতে চাইতো তখনই বালকটি আল্লাহর কাছে দোয়া করত এবং আল্লাহর দয়ায় বালকটি বেঁচে যেতো।একদিন বালকটি নিজেই রাজাকে বললেন আমাকে একটি গাছের সাথে বেঁধে সবাইকে জড়ো করেন এবং একটি তীরে "বিসমিল্লাহ, "এই বালকের রবের নামে" বলে আমাকে তীর মারেন তাহলেই আমি মারা যাব।রাজা বালকের কথা অনুযায়ী অসংখ্যা মানুষের মাঝে তার বলা পদ্ধতিতে সত্যি বালকটিকে হত্যা করতে সক্ষম হন ।বালকটি মারা যাওয়ার পর সেখানে উপস্থিত সকল লোকেরা সত্য ধর্মের প্রতি ঈমান আনে।রাজা যখন এ বিষয় সর্ম্পকে অবগত হন তখন তিনি ঈমান আনায়নকৃত সেই সকল লোকদের তাদের সত্য ধর্মত্যাগ করতে বলেন।কিন্তু তারা সকলে তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে অশ্বিকৃতি জানায় যার কারনে রাজা সেই সকল লোকদের হত্যা করেন।এমন নির্মম হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে রোমের বাদশা যখন জানতে পারেন তখন তিনি এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করার সিদ্ধান্ত নেন।তিনি হাবসার রাজাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলে হাবসার রাজা তার একটি

সৈন্যদল প্রেরণ করেন যু-নাওয়াস বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য।ঐ যুদ্ধে যূ-নাওয়াস পরাজিত হয় এবং সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে।

আসহাবে ফীল

এ ঘটনাটি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জন্মের ৫০-৫৫ দিন পূর্বে সংগঠিত হয়েছিল।আল্লাহ এই ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে পবিত্র কোরআনে সূরা ফীল নাজিল করেছেন।

আবরাহা ইয়ামানে একটি গির্জা স্থাপন করে যার সমতুল্য সৌন্দর্য দ্বিতীয় কোন ঘর আর ছিলোনা।তিনি চেয়েছিলেন হাজীগণ হজ্বেরর উদ্দেশ্যে মক্কায় না গিয়ে তার গির্জায় যাবেন এবং সেখানে ইবাদত করবেন।আবরাহার এই সিদ্ধান্ত একাধিক গোত্রের মানুষের কাছে অসভনীয় হয় উঠে।এক রাতে বনু কিনানা গোত্রের এক লোক আবরাহার প্রতিষ্ঠিত সেই গির্জায় প্রকৃতি কার্য সেরে পালিয়ে আসেন।আবরাহার এ খবর সম্পর্কে জানতে পেরে অত্যধিক রাগান্বিত হয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওনা হন।মক্কায় যাত্রাকালে আব্রাহার এক দলব্যক্তি ২০০ উট লুট করে নিয়ে আসেন।সেই ২০০ উট ছিলো আব্দুল মুত্তালিবের।আবরাহার একজন দূত মক্কায় প্রেরণ করলেন মক্কার সবচেয়ে সম্ভ্রান্তময় ব্যক্তিকে তার কাছে আনার জন্য। সে সময়মক্কার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ময় ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল মুত্তালিব।আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান এবং তিনি তার ২০০ উট আবরাহা থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং তাকে অবগত করেন তিনি উটের মালিক কাবা ঘরের মালিক নন।কাবা ঘরের মালিক অন্য কেউ।আব্দুল মুত্তালিব মক্কায় ফিরে গিয়ে মক্কাবাসীদের নিয়ে গোপন জায়গায় আশ্রয় নেন এবং দোয়া করতে থাকেন। পরদিন সকালে আবরাহা তার সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে রওনা হয় কাবাঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে কিন্তু পথিমধ্যে তার হাতিটি বসে পড়ে এবং শত চেষ্টা করেও তাকে কিছুতেই দাঁড় করানো সম্ভব হচ্ছিল না।হাতিটিকে যখন ইয়ামান, আবিসিনিয়ার মুখী করা হচ্ছিল তখন হাতিটি দৌড়ানো শুরু করে কিন্তু যখনই তাকে মক্কা অভিমুখী করা হয় তখনই হাতিটি বসে পরে এবং ঠিক সেই সময়ে তিনটি করে নুড়ি নিয়ে ঝাকে ঝাকে অসংখ্য আবাবিল পাখি এসে আবরাহা বাহিনীর উপর ফেলতে লাগলো।যার ফলে তার অসংখ্য সৈন্য

সেখানেই মারা গেল এবং আবরাহা নিজেও গুরুতরো ভাবে আহত হলো।সানায় পৌছানোর পর আবরাহা শরীর থেকে হৃদপিণ্ড বের হয়ে যায় এবং তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

নবিজির বংশপরিচিতি, জন্ম ও শৈশব

নবিজি -সাঃ এর বংশধারা অত্যান্ত সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাশীল।এই কথাটি এমন এক বাস্তব সত্য যা আজ পযন্ত কেও উপেক্ষা করতে পারিনি।নবিজী সাঃ নিজেই বলেছেন তার বংশ হচ্ছে সেরা বংশ হতে সেরা বংশ এবং তিনি সেই সেরা বংশের বৈবাহিক সম্পর্কিত বৈধ সন্তান।আদম আঃ শুরু করে তার সময় পযন্ত তার বংশে কোন অবৈধ সন্তান জন্ম গ্রহন করেননি।জাহিলি যুগের জাহিলিয়াত তার বংশকে স্পর্শ করতে পারেনি।

পিতার দিক থেকে নবিজির বংশপরিক্রমা

রাসুলুল্লাহ সাঃ নিজেই তাঁর থেকে শুরু করে আদনান পর্যন্ত বংশধারা বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, "বংশবিদগণ ভুল করেছে"। অর্থাৎ আদনান থেকে উপরের দিকে বংশপরম্পরা সুনির্দিষ্ট সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে পাওয়া যায় না। তবে অনেক বংশবিদ আদনান থেকে আদম আঃ পর্যন্ত বংশধারা উল্লেখ করেছেন যার সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। এজন্য তা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এখানে আদনান থেকে রাসূল সাঃ পর্যন্ত বংশধারা উল্লেখ করাটাই যথেষ্ট হবে। রাসূল সাঃ এর পৈত্রিক বংশধারা হল-

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আব্দে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর বিন মালিক বিন নাযার বিন কিনানাহ বিন খুযায়মাহ বিন মুদরিকা বিন ইলিয়াস বিন মুযার বিন নিযার বিন মা'আদ্দ বিন আদনান।(IOM সিরাহ শীট)

রাসূল সাঃ এর মাতৃবংশধারা হল-

মুহাম্মাদ বিন আমিনা বিনতে ওয়াহাব বিন আব্দে মানাফ বিন যুহরাহ বিন কিলাব...

অর্থাৎ রাসূল সাঃ এর পিতা ও মাতার বংশ কিলাব পর্যন্ত পৌঁছে এক হয়ে গিয়েছে।(IOM সিরাহ শীট)

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জন্ম

রাসূলুল্লাহর সাঃ মক্কার বিখ্যাত মর্যাদাপূর্ণ সেরা হতে সেরা বনু হাশিম গোত্রে হস্তীবর্ষে ৯ রবিউল আওয়াল (আবরাহার বাহিনী ধ্বংস হওয়ার ৫০-৫৫ দিন পর) সোমবার আবু তালিবের ঘরের নুর ও বরকত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি পঞ্জিকামতে তারিখটি ছিলো ৫৭০ ঈসায়ি সালের

২০ অথবা ২২ এপ্রিল।

আব্দুল মত্তালিবের নিকট যখন রাসুলুল্লাহ সাঃ জন্নগ্রহণের শুসংবাদটি পৌছানো হলো তখন তিনি অত্যাধিক খুশি হলেন এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে গেলেন এবং নবজাতক মুহাম্মদ সাঃ কোলে নিয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন এবং তাঁর জন্য কাবা ঘরের সামনে দাড়িয়ে দোয়া করতে থাকেন।এরপর তিনি তার নাম রাখলেন মুহাম্মদ।

মুহাম্মদ সাঃ এর আরও বেশ কিছু নাম আছে :

আহমাদ (أحمد):

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আহমাদ অর্থ সর্বোত্তম মানে (গুণে) (Highest Quality) প্রশংসিত। রাসূল সাঃ এর প্রশংসার জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং স্বয়ং আল্লাহ যে ভাষাশৈলী ও শব্দাবলী দিয়ে তাঁর প্রশংসা করেছেন তার কোন তুলনা হয় না। তাঁর চেয়ে উত্তম মানের প্রশংসা কাউকে করা যেতে পারে না আর না কেউ তার হকদার।

আল মাহি (الماحي):

আল মাহি অর্থ 'যে কোনকিছুকে মুছে ফেলে'। রাসূল সাঃ এর মাধ্যমে শির্ক ও কুফরকে মুছে ফেলা হয়েছে। এজন্য তাঁর নাম আদ মাহি।

আল হাশির (الحاشر):
আল হাশির অর্থ 'যার পেছনে একত্রিত করা হয়'। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম রাসূল সাঃ কে পুনরুত্থিত করা হবে এবং সমগ্র মানবজাতি তাঁর পরে উত্থিত হবে। এজন্য তাঁর একটি নাম আল হাশির।

আল আকিব (العاقب):আল আকিব অর্থ 'কোন ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে যিনি আসেন'। রাসূল সাঃ নবী ও রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে এসেছেন এবং তাঁর পর আর কোন নবী-রাসূল আসবে না। তাঁর মাধ্যমেই রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আল্লাহ বলেন-

ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
অর্থঃ মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (সূরা আহযাব, ৩৩:৪০)
এজন্য তাঁর একটি নাম আল আকিব।

নাবিয়্যুর রহমাহ (نبي الرحمة)
নাবিয়্যুর রহমাহ অর্থ 'রহমতের নবী'। রাসূল সাঃ কে আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمين

অর্থঃ আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। (সূরা আল আম্বিয়া, ২১:১০৭)

নাবিয়্যুত তাওবাহ (نبي التوبة)
নাবিয়্যুত তাওবাহ অর্থ 'তাওবাহ-র নবী'। রাসূল সাঃ কে কেউ মেনে নিয়ে তাওবাহ করে যদি ইসলামের পথে ফিরে আসে তবে সে দুনিয়া পরকালে সফলকাম হবে। তাই তিনি নাবিয়্যুত তাওবাহ।

আল মুকাফফাহ (المقفى)
আল মুকাফফাহ অর্থ 'যিনি কোনকিছুকে পূর্ণতা দেন'। রাসূল সাঃ এর আগমনের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের বানী ও
রিসালাতের পূর্নতা পেয়েছে। এজন্য তিনি আল মুকাফফাহ।

নাবিয়্যুল মালাহিম (نبي الملاحم)
নাবিয়্যুল মালাহিম অর্থ 'ফিতনার নবী'। রাসূল সাঃ এর আগমনই কিয়ামতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন এবং কিয়ামতের পূর্বে আসবে প্রচুর পরিমাণে ফিতনা, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফিতনা হল দাজ্জালের ফিতনা। এছাড়াও কিয়ামতের পূর্বে একের পর এক ফিতনার আবির্ভাব হবে। এজন্য তিনি নাবিয়্যুল মালাহিম।

রাসূল সাঃ এর কুনিয়াত বা উপনামঃ
রাসূল সাঃ এর সর্বাধিক পিরিচিত কুনিয়াত ছিল আবুল কাসিম। তাঁর বড় পুত্র কাসিমের নাম থেকেই এই নাম এসেছিল। তাঁর দ্বিতীয় কুনিয়াত ছিল আবু ইব্রাহীম। রাসূল সাঃ এর ক্রীতদাসী মারিয়া কিবতিয়্যা এর গর্ভজাত সন্তান ইব্রাহীম এর নাম থেকে এই নাম এসেছিল। কাসিম ও ইব্রাহীম উভয়েই শিশু অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

সিরাহ শীট IOM

রাসূলুল্লাহ সাঃ জন্মের পর তাকে সর্বপ্রথম দুধ পান করান তার আপন মাতা আমিনা। এরপর দুধ পান করিয়েছিলেন আবু লাহাবের দাসী 'সুওয়ায়বা।এরপর আল্লহর হুকুমে রাসুলুল্লাহ সাঃ কে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন হালিমাতুস সাদিয়া রাঃ।
তখনকার আরব সমাজে সভ্রান্ত লোকদের নিয়ম ছিল শহরের পরিবেশ জনিত রোগব্যধি কুপ্রথা ও অশুদ্ধ ভাষা থেকে নিজের সন্তানকে রক্ষা করার জন্য দূরে

উন্নত গ্রাম্য পরিবেশে দুধ মায়ের কাছে ন্যস্ত করা। গ্রাম্য পরিবেশে উন্নত আবহাওয়ায় শিশুরা সুস্বাস্থ্য ও মজবুত দেহ মজবুত দেহের অধিকারী হতো।তারা নির্ভেজাল পুষ্টিকর খাদ্য গ্রগন করতো এবং গ্রামীন পরিনেশে মুক্ত মাঠে খেলাধুলা করতো এনং তারা গ্রামের শুদ্ধ আরবি ভাষা সহজে শিখে যেতো।
আরবদের সেই নিয়ম অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জন্যও দুধ মাতার সন্ধান করা হচ্ছিল যার কাছে তাকে নাস্তা করা যায়।

দূর দূরান্ত গ্রাােম্য মহিলারা মক্কায় আসতো দুগ্ধপৌষ্য শিশু সংগ্রহ করতে।একবার একদল মানুষ মক্কায় আশে শিশু সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য ঠিক সে সময়েও রাসুলুল্লাহ সাঃ পরিবার তার জন্য দুধ মাতার সন্ধান করছিলেন।মক্কায় আগত নারীগণ একে একে শিশু সংগ্রহ করে চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু শিশু মোহাম্মদকে কেউ গ্রহণ করতে চায়নি কারন হচ্ছে তিনি ছিলেন ইয়াতিম এবং মক্কায় সে বছর দুর্ভিক্ষের কারণে বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের অভাব দেখা গিয়েছিল।এসব শিশুদের লালন পালন করে তেমন একটা লাভবান হওয়ার তেমন কোন সুযোগ ছিলোনা।কিন্তু তায়েফ থেকে আগমন কৃত এক নারী শিশু মুহাম্মদ কে ঠিকই গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন সাদিয়া হালিমা রাঃ
মুহাম্মদ সাঃ কে হালিমার কোলে ন্যস্ত করার ঘটনাটি এরকম______
নবিজির দুধমা হালিমা সাদিয়া রা বলেন, 'আমি তায়েফ থেকে সাআদ গোত্রের মহিলাদের সঙ্গে দুখপোষ্য শিশু সংগ্রহের জন্য মক্কার উদ্দেশে রওনা দিই। সে বছর দেশে দুর্ভিক্ষ চলছিল। তখন আমার কোলেও দুধপায়ী এক সন্তান ছিল। তবে আমরা বেশ দারিদ্র্যপীড়িত ছিলাম। অনাহারের ফলে আমার বুকে এতটুকু দুধ ছিল না যে, আমার কোলের শিশুটি তৃপ্তিতে পান করবে। ফলে শিশুটি সারা রাত ক্ষুধায় ছটফট করত। আর আমরা তার কারণে ঘুমোতে পারতাম না। সারাটি রাত বসে বসে কাটিয়ে দিতাম। আমাদের একটি উটনী ছিল কিন্তু সেটিরও তখন দুধ ছিল না। এভাবে কষ্ট ও ক্ষুধায় আমরা দিন কাটাতাম। এতকিছুর পরও আমরা দুদ্ধপোষ্য শিশ নেওয়ার মনস্থ করি।
মক্কার উদ্দেশে রওনার সময় আমি যে গাধায় আরোহণ করি, সেটাও নিতান্ত দুর্বল ছিল। ফলে কাফেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না। এ জন্য সফরসঙ্গ্যারা

আমাদের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করছিল। এভাবে অনেক কষ্টে একপর্যায়ে আমরা মক্কায় পৌঁছাই। (সিরাতে খতামুল আম্বিয়া)

সেখানে পৌঁছার পর কাফেলার মহিলারা শিশু মুহাম্মদকে গ্রহন না করায় স্বামী হারিস বিন আব্দুল উযযা-র সাথে পরামর্শ করে হালিমা ইয়াতীম শিশু মুহাম্মাদ সাঃ কে দুধ পান করানোর জন্য গ্রহণ করতে রাজী হলেন। শিশু মুহাম্মাদ সাঃ কে গ্রহণ করার পর থেকেই অত্যাশ্চর্য বরকতময় সব ঘটনা হালিমা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন এবং আন্দাজ করতে পারলেন যে, এই শিশু স্বাভাবিক কোন শিশু নয়।
শিশু মুহাম্মাদ সাঃ কে নিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসার পর হালিমা লক্ষ্য করলেন যে তার স্তনও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অতঃপর শিশু মুহাম্মাদ সাঃ এবং হালিমার সন্তান একত্রে দুধপান করে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। সাথের উটের ওলানও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। হালিমা ও তার স্বামী উটের দুধ দোহন করলেন এবং তৃপ্তি সহকারে পান করালেন।
মক্কা থেকে ফিরে আসার সময় তাদের বাহনের গাধাটি শক্ত-সামর্থ্য হয়ে উঠে এবং এত দ্রুত পথ চলতে থাকে যে অনারা পিছে পড়ে যায়। হালিমা বলেন, 'আমাদের অঞ্চলে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। কিন্তু আল্লাহর অসীম কুদরতে আমার পালিত পুত্রের বরকতে আমাদের কোনো অভাব ছিলনা। অন্যান্য পরিবারের মেষ ও ছাগপালের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল খাদ্যের অভাবে। কিন্তু আমাদের ছাগ ও মেষপাল দিনের শেষে ঘরে ফিরে আসতো দুধভরা স্তন নিয়ে।তায়েফে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল দুধের পশু গুলো ছিল দুধ শূন্য কিন্তু আমার বাড়িতে আমাদের বকরিগুলোর স্তন্য দুধে ভরে ওঠে যেখানে আশেপাশে অন্য কারোর পশু স্তনে এক ফোঁটা দুধের দেখা নেই এ দৃশ্য দেখে আমার গোত্রের লোকেরা তাদের রাখালদের বলতে লাগলো তোমরাও পশুগুলো নিয়ে সেখানে ছাড়াও যেখানে হালিমার বকরিগুলো চড়ানো হয় অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এখানে মাঠের কোন বিশেষত্ব ছিল না। প্রতিবেশীরা অধিক খাদ্যের আশায় তাদের মেষরাশি আমাদের মেষপালের সাথে একইস্থানে পাঠাতো। কিন্তু তাদের মেষপালগুলো ফিরে আসতো খালিপেটে। আর আমাদের মেষপাল আসতো ভরাপেটে স্তনভর্তি দুধ নিয়ে। আমার স্বামী এ অবস্থা দেখে বলতেন,

হালিমা। 'আমাদের এ সন্তান ভবিষ্যতে অতি উঁচুদরের মানুষ হবে'।(iom সিরাহ শীট)

আরবদেশ নিয়ম ছিলো তাদের শিশুরা ২বছর হয়ে গেলে দুধ মাতারা তাদের শিশুদের পুনরায় তাদের পরিবারের কাছে দিয়ে দিতেন।আরব নিয়ম অনুযায়ী মুহাম্মদ সাঃ যখন দু বছর বয়স হলো তখন হালিমা রাঃ শিশু মুহাম্মদ কে দুধ ছাড়িয়ে দিলেন।শিশু মোহাম্মদ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন যার কারণে তার বয়স ২ বছর হলেও তিনি উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন।

শিশু মুহাম্মদ হালিমা রাঃ ঘরে আসার পর তাদের জীবনে যে বরকত ও কল্যাণের জোয়ার বয়ে যায় সে কারণ সুবাদেই তিনি শিশু মুহাম্মদকে তার পরিবারের কাছে ফেরত দিতে চাচ্ছিলেন না।কিন্তু ইচ্ছা না থাকার সত্বেও আরবদের নিয়ম অনুযায়ী হালিমা সাদিয়া রাঃ শিশু মুহাম্মদ কে তার মাতা আমিনার কাছে ফেরত দেওয়া উদ্দেশ্যে মক্কায় যান কিন্তু ঘটনা ক্রমে সে বছর মক্কায় মহামারী দেখা গিয়েছিল যার কারণে হালিমা রাঃ শিশু মুহাম্মদকে পুনরায় নিজের কাছে নিয়ে আসেন এবং তার লালন পালন করতে থাকেন।শিশু মোহাম্মদ স্বভাবতই খুব শান্তশিষ্ট ছিলেন। তিনি বাইরে যেতেন অন্যান্য শিশুদের খেলাধুলা করতে দেখতেন কিন্তু তিনি কারো সাথে খেলতেন না এবং তিনি বেশিরভাগ সময় চুপচাপ ও একাকী থাকবেন।

মুহাম্মদ তার দুধ তার দুধ ভাইয়ের সাথে মাঠে বকরি চরাতে যেতেন।এমনই একদিন তিনি তা দুধ ভাইয়ের সাথে বকরি চরাতে গিয়েছিলেন ঠিক তখনি দুজন সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি আসেন (বর্ণনা মতে সাদা পোশাক পরিহিত দুজন ব্যক্তি ছিলেন জিব্রাইল আঃ ও মিকাইল আঃ) এবং তাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তার সম্পূর্ণ বুক চিরে হৃদপিণ্ড বের করেন।তার হৃদপিণ্ড থেকে এক টুকরো জামাট বাধা রক্ত বের করে ফেলে দেন এবং বলেন এটা ছিল শয়তানের অংশ। তারপর জমজম পানি দিয়ে তার হৃদপিণ্ড ধৌত করে পুনরায় স্থাপন করা হয়।ঐ সময় তার দুই কাঁধের মাঝে খতমে নবুওয়ত মোহার স্থাপন করা হয়।শিশু মোহাম্মাদের দুধ ভাই এসব কিছু দেখে তার মাতা পিতার নিকট যান এবং তাদের

এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত করেন।হালমা রাঃ সব ঘটনা শুনে ভয় পেয়ে যায় এবং শিশু মুহাম্মদ কে ঘরে নিয়ে আসেন।

এই ঘটনা ঘটার পরে হালিম রাঃ শিশু মোহাম্মদকে এক গণকের কাছে নিয়ে যান।উল্লেখ যে শে সময় তায়েফের
লোকেরা একটা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। গগন যখন শিশু মুহাম্মদকে দেখেন তিনি তখনই সব বুঝতে পারেন এবং ভবিষ্যতে তিনি যে নতুন এক দ্বীনপর প্রচার করবেন সে সম্পর্কে হালিমা রাঃ অবগত করেন।গগন তাদের বলেছেন শিশু মুহাম্মদ কে হত্যা করে ফেলো কিন্তু হালিমা রাঃ এসব কথা শুনে ভয়ে শিশু মুহাম্মদকে গণকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন এবং তাকে নিয়ে নিজ গৃহে চলে আসেন।বক্ষ বিদারণ ও গণকের হত্যা করার বিষয় গুলো নিয়ে তিনি অধিক চিন্তিত ছিলেন।তিনি ভাবছিলেন তিনি হয়তো শিশু মুহাম্মদ কে সঠিক নিরাপত্তা দিতে পারবেন না যার কারণে তিনি শিশু মোহাম্মদকে তার আপন মাতা আমিনার নিকট ফিরিয়ে দাও সিদ্ধান্ত নেন।বিশেষ করে গণকের হত্যা করা সেই ঘটনাটি শিশু মুহাম্মদ কে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে বেশি উদ্বুদ্ধ করে।

হালিমা যখন নবিজিকে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে যান, আমিনা তখন প্রশ্ন করেন, 'এত আগ্রহের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পর এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসার কারণ কী?' অনেক পীড়াপীড়ির পর হালিমা সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলেন। আমিনা সব শুনে বলেন, 'নিশ্চয় আমার ছেলের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।' তখন তিনি তাঁর গর্ভাবস্থা ও প্রসবকালীন বিস্ময়কর ঘটনাগুলো তাঁকে শোনান।**(ইবনু হিশাম :৯)**

ধাত্রীগৃহ থেকে প্রাণের টুকরো নয়নমণি সন্তানকে ফেরত পাওয়ার পর বিবি আমিনা ইয়াসরিব (মদিনার পূর্ব নাম) গিয়ে তাঁর স্বামীর কবর যিয়ারত করার মনস্থ করেন। অতঃপর শ্বশুর আব্দুল মুত্তালিবের ব্যবস্থাপনায় শিশুপুত্র মুহাম্মদ এবং পরিচালিকা উম্মে আইমানকে সাথে নিয়ে মক্কা-মদিনার মধ্যবর্তী পাঁচশত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মদিনায় পৌঁছেন। সেখানে এক মাস অবস্থানের পর মক্কায় ফিরে

আসার উদ্দেশ্যে তিনি মদিনা থেকে যাত্রা শুরু করেন। সামনে মক্কা অনেক দূরের পথ, পেছনে মদিনা স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত। পথচলার এমনি একপর্যায়ে বিবি আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে তাঁর রোেগ বৃদ্ধি পেতে লাগালো।অবশেষে এতিম ও শিশু নবী মুহাম্মদ এবং আত্মীয়-স্বজনকে শোকসাগরে ভাসিয়ে 'আবওয়া' নামক স্থানে পরলোক গমন করেন।**(ইবনে হিশাম,প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড ১৬৮ পৃ)**

মাতা আমিনার মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ সাঃ তার দাদর ঘরে লালিত পালিত হতে লাগলেন।রাসুলুল্লাহ সাঃ বয়স যখন ৮ বছর তখন আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করেন।আব্দুল মুত্তালিব এর মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ সাঃ এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন আবু তালিব।আবু তালিব রাসুলুল্লাহ সাঃ পিতার স্নেহ দিয়ে লালন পালন করতে লাগলেন।

নবীজি সাঃ এর দৈহিক অবয়ব,চরিত্র-বৈশিষ্ট্য

হিলুদ ইবনে আবু হালা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর দেহাবয়ব সম্পর্কে বলেন, তাঁর চেহারা ছিল পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। স্বাভাবিকভাবে চুলে সিঁথি প্রকাশ পেলে রেখে দিতেন, অন্যথায় কষ্টকল্প করে সিঁথি কাটতেন না। চুল বড় হয়ে গেলে তা কানের লতি পর্যন্ত স্কুলে যেত। গায়ের রঙ অতিশয় সুন্দর, প্রশস্ত কপাল ও ভ্র-যুগল কিঞ্চিত বক্র ও ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল। জ দু'টি সম্মিলিত ছিল না, পৃথক পৃথক ছিল। দুই জ্বর মাঝখানে একটি রগ ছিল, যা রাগের সময় স্ফীত হত। তাঁর নাক তীক্ষ্ণ ও উন্নত ছিল এবং তাতে নূর চমকাত। হঠাৎ দেখলে তাঁকে বড় নাকবিশিষ্ট মনে হত। ভালোরূপে তাকালে অবশ্য বুঝা যেত যে, তা মানানসই উঁচু। তাঁর দাড়ি ছিল ঘন ও ভরপুর, গাল দুটি স্বল্প মাংসল ও মসৃণ, মুখ বিবর পরিমিত প্রশস্ত। দন্তরাজি চিকন ও উজ্জ্বল, সামনের দাঁত দুটির মাঝখানে কিঞ্চিত ফাঁক ছিল। গর্দান ও কণ্ঠদেশ কিছুটা লম্বা ঝকঝকে রৌপ্য চিত্রের ন্যায় সুন্দর-সুঠাম ছিল। পেট ও বক্ষদেশ ছিল সমতল কিন্তু প্রশস্ত দুইত বাহুর মাঝখানে কিছুটা দূরত্ব ছিল। তাঁর উভয় বাহু, কাঁধ ও বুকের উপরিভাগে লোম ছিল। তিনি প্রায়ই নতদৃষ্টিতে থাকতেন। আসমানের চাইতে জমিনের দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ থাকত। পথ

চলার সময় সঙ্গীদের আগে যেতে দিতেন (এবং নিজে পেছনে থাকতেন)। কারও সাথে সাক্ষাত হলে তিনিই আগে সালাম দিতেন। **(IOM সিরাহ শীট)**

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর চরিত্র -বৈশিষ্ট্য :

রাসুলুল্লাহ সাঃ ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।তিনি আমাদের আদর্শ। আল্লাহ পবিত্র কোরআন নিজেই বলেছেন_____

তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। [সুরা ক্বলাম আয়াত-৪]

স্বভাবতই তিনি ছিলেন নরম মন ও কোমল কণ্ঠের মানুষ।কথা বলার সময় সালাম দিয়ে বিনয়ের সাথে কথা বলতেন।প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা দিয়ে তা পালন করা ছিলো তার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।বেশিরভাগ সময় তিনি তার উম্মতের জন্য চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন।প্রয়োজন ছাড়া তিনি কথা বলতে না।কথা বললেও অল্প বাক্যে কথা এমন ভাবে শেষ করতেন যা সকলের নিকট বোধগম্য হতো। তিনি কোন খাবারের দোষ ধরতেন না।খাবার পছন্দ না হলে খেতেন না বা অল্প খেতেন কিন্তু খুত ধরতেন না।তিনি তার পার্থিক এবং সাংসারিক বিষয়ে কখনো রাগান্বিত হননি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল। ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে তিনি কখনো কাউকে আঘাত করেননি এবং প্রতিশোধও নেননি।তিনি কারো প্রতি কঠোরভাষী ছিলেন না।কখনো কাউকে কোন অপবাদ দিতেন না কারো দুর্নাম করতেন না এবং কারো সাথে কখনো ঝগড়াও করেননি।তিনি কারো দোষ ধরতেন না।তিনি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি তার সমগ্র জীবনে একটিও মিথ্যা কথা বলেননি।তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ন শাসক ও বীর যোদ্ধা।মক্কার কাফের মুশরিকদের প্রতি তার ব্যবহার এতটাই উওম ছিলো যে তারা ব্যবহার দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতেন এবং একেই লোকেরা যাদু বলতো।মানুষের সাথে তিনি উওম সম্পর্ক গড়ে তুলতেন এবং অসহায় মানুষের সাহায্য করতেন।তিনি কখনো কাউকে খালি হাতে ফেরাননি।তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল।শ্রমিকদের শরীরে ঘাম শুকানোর আগে তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করতেন।দাসদাসীদের কখনো কোন কাজে হুকুম দিতেন না এবং কোন দোষ ও ধরতেন না।তিনি তার সকল কাজ নিজেই করতেন।রাতের

শেষ অংশে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন হতেন।তার জীবনের শেষ মুহূর্তেও তিনি শুধু তার উম্মতের ফিকির করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গুণাবলী লিখে শেষ করাটা কষ্টসাধ্য।যুগে যুগে অসংখ্য ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে অগাদ গ্রন্থ রচনা করেছেন যা হয়তো কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে চলতেই থাকবে।

নবীজির বিয়ে, নবুওয়াত প্রাপ্তি, গোপনে ও প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

আব্দুল মুত্তালিব এর মৃত্যুর পর আবু তালিব নবীজি সাঃ এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।আবু তালিব যখন শামে ব্যবসার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তখন তার সঙ্গে নবীজিও ছিলেন।কিন্তু কিছু ঘটনাক্রমে নবীজি নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আবু তালিব তাকে পুনরায় মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।তিনি দ্বিতীয়বার ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে গমন করেন খাদিজার রাঃ বাণিজ্যিক পন্য নিয়ে।

খাদিজা রাঃ ছিলেন একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী মহিলা।মক্কার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন খাদিজা রাঃ।মক্কার বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের তিনি অর্থ ও পণ্য দিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে পাঠাতেন।সে ব্যবসা হতে যা লাভ হতো তা হতে নির্দিষ্ট একটি অংশ সেই ব্যক্তিদের প্রধান করতেন।রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা দেখে খাদিজা রাঃ তাকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে গমন করার প্রস্তাব দিলেন এবং তাকে আশ্বস্ত করলেন অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে তাকে অধিক লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।রাসুলুল্লাহ সাঃ খাদিজা রাঃ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং শামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।শামে পৌছে তিনি খাদিজা রাঃ পন্য অধিক মুনাফায় বিক্রি করে মক্কায় ফিরে এসে খাদিজ রাঃ কে মূলধনসহ লাভের অংশ বুঝিয়ে দেন।খাদিজা রাঃ ঐবার এতো পরিমাণ লাভ করেছিলেন যা তিনি ইতিপূর্বে করেননি।খাদিজা রাঃ রসুলুল্লাহ সাঃ এর বিচক্ষণতা, সত্যবাদিতা,আমানতদারীতা ও উওম চরিত্র দেখে তার প্রতি মুগ্ধ হন এবং তার বান্ধবীর মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান।রাসুলুল্লাহ সাঃ এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন

করেন এবং পবিত্রক্ষণে রাসুলুল্লাহ সাঃ ও খাদিজা রাঃ পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

মুহাম্মদ সাঃ এর সাথে বিবাহের সময় বিবি খাদিজা (র)-এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। বংশ-মর্যাদা, সহায়-সম্পদ বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের এক অনুপমা মহিলা এবং রাসূল-এর প্রথম সহধর্মিনী। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর কোনো বিয়ে করেননি।(ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড ১৮৯ ও ১৯০ পৃ। ফিকহুস সীরাহ ৫৯ পৃ. ও তালকীহুল ফোহুম ৭ পৃ.)

রাসূল-এর সন্তানদের মধ্যে ইবরাহিম (র) ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিলেন খাদিজা (রা)-এর গর্ভজাত সন্তান। নবী দম্পতির প্রথম সন্তান ছিলেন কাসেম, তাই মুহাম্মদ-এর উপনাম হয় 'আবুল কাসেম, অর্থাৎ কাসেমের পিতা'। অতঃপর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা ও আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহর উপাধি ছিলো। 'তাইয়েব' এবং তাহের'।(সিরাতুল খাতামুল আম্বিয়া)

রাসূল-এর সকল পুত্র সন্তান বাল্যকালেই মৃত্যুবরণ করেন। তবে কন্যাদের মধ্যে সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন, মুসলমান হয়েছেন এবং মুহাজিরের মর্যাদাও লাভ করেছেন। কিন্তু ফাতিমা (র) ব্যতীত কন্যাগণ সকলেই পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন। ফাতিমা (রা)-এর মৃত্যু হয়েছিলো রাসূল-এর মৃত্যুর ৬ মাস পর।(ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ২৯০ ও ১৯১ পৃ. ফিকহুস সীরাহ ৬০ পৃ,। ইবন হাজর আল-আসকালাবী ফতহুল বারী ৭ম খন্ড ১৫০ পৃ)

খাদিজা রাঃ সহ রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও ১০ জন স্ত্রী ছিলেন।খাদিজা রাঃ মৃত্যুর পরে তিনি যে ১০ জন মহীয়সী নারীদের বিয়ে করেছিলেন তারা হলেন______

১.সাওদা বিনতু জামআ রাঃ

২.আয়েশা রাঃ

৩.হাফসা বিনতু উমর

৪.জায়নাব বিনতু খুজায়মা

৫.উম্মু সালামা

৬.জায়নাব বিনতু জাহাশ

৭.জুওয়াইরিয়া

৮.উম্মু হাবিবা

৯.সাফিয়া রাঃ

১০.মাইমুনা রাঃ

নবুওয়াত প্রাপ্তি

রাসুলুল্লাহ সাঃ ৪০ বছর বয়সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন।নবুওয়াত প্রাপ্তির ৩ বছর আগে থেকে নবীজি সাঃ নির্জনতা ও একাকীত্বকে পছন্দ করতে লাগলেন যার দরুন তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করা শুরু করেছিলেন।সেখানে রাসুলুল্লাহ সাঃ ধ্যানমগ্ন থাকতেন ও ইবাদত বন্দেগী করতেন।হেরা গুহায় যাওয়ার আগে তিনি প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় সাথে করে নিয়ে যেতেন।যখন তা শেষ হয়ে যেত পুনরায় নিজ গৃহে এসে খাদ্য পানি সংগ্রহ করে হেরা গুহায় চলে যেতেন।এমন করে কেটে যায় ৩ বছর।এভাবে তৃতীয় বর্ষে হেরা গুহায় অবস্থানকালে জিবরাইল আঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে তার নিকট আগমন করেন।জিবরাইল ফেরেশতা রাসুলুল্লাহ সাঃ কে বললেন "তুমি পড়ো"। তিনি বললেন "আমি পড়তে জানিনা" এ কথা শুনে জিবরাইল ফেরেশতা তাকে শক্ত করে আলিঙ্গন করলেন এরপর ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বললেন "তুমি পড়"। রাসুলুল্লাহ সাঃ তখনও বললেন "আমি পড়তে জানিনা "। এরপর পুরানয় জিবরাইল ফেরেশতা রাসুলুল্লাহ সাঃ কে শক্ত করে আলিঙ্গন করে তাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন______

(১)পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

(২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড হ’তে।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

(৩) পড়। আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু।

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

(৪) যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন।

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

(৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

জিবরাইল আঃ রাসুলুল্লাহ সাঃ কে সুরা আলাকের এই ৫ আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন এবং চলে গেলেন।এভাবে পবিত্র কোরআনের প্রথম ৫ আয়ত নাজিল হলো এবং রাসুলুল্লাহ সাঃ রিসালাত প্রাপ্ত হলেন।

রাসুলুল্লাহ সাঃ ওহী নাজিলের এই সার্বিক ঘটনায় অনেকটা ভীতি সাবস্ত হয়ে পরেন এবং অস্থির হয়ে খাদিজা রাঃ এর নিকট ফিরে যান এবং বলতে থাকেন "আমাকে বস্ত্রাবৃত করো "। খাদিজা রাঃ এ কথা শুনে তাকে বস্ত্রাবৃত করলেন। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর রাসুলুল্লাহ সাঃ যখন শান্ত হলেন তখন প্রিয়তম স্ত্রীর কাছে হেরা গুহায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটি খুলে বললেন।খাদিজা রাঃ সব শুনে রাসুলুল্লাহ সাঃ আশ্বস্ত করে বললেন " আপনি আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন, অভাবীদের অভাবমোচন করেন, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের সাহায্য করেন,মেহমানদের আদর- যত্নের সহিতে আপ্যায়ন করেন নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবে না।

গোপনে ও প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

রাসুল-এর ওপর যখন প্রথম ওহি নাজিল হয়, তখন প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি আদিষ্ট ছিলেন না। তখন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধান নাজিল হতো।(দুরুসুস সিরাতিল মুহাম্মদ)

কিছুদিন ওহি নাজিলের ধারা বন্ধ থাকে।ওহি নাজিলের ধারা বন্ধ থাকায় রাসূলুল্লাহ সাঃ বিচলিত হয়ে পড়েন।তিনি এতটাই বিচলিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে পর্বত

শিখর থেকে মৃত্যুবরণ করার কথা ভাবতেন।এমনই একদিন তিনি মৃত্যুবরণের উদ্দেশ্যে পর্বতের শিখরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই জিবরাইল ফেরেশতা তার দৃষ্টিগোচর হয়ে বললেন" আপনি আল্লাহর রাসূল আমি জিবরাইল ফেরেশতা "।এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর অন্তর শান্ত হলো এবং তিনি বাড়ির উদ্দেশ্য প্রত্যাবর্তন করলেন।বাড়ি ফেরার পর রাসুলুল্লাহ সাঃ খাদিজা রাঃ কে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন।খাদিজা রাঃ সব শুনে তাকে আশ্বস্ত করলেন তিনি আল্লাহর নবী তাই তার সাথে এমন অলৌকিক ঘটনার অবতরণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়বারে যখন ওহী নাযিল শুরু হয় তখন রাসুলুল্লাহ সাঃ কে ইসলাম প্রচারের আদেশ করা হয়েছিলো।সে সময় পৃথিবীর মানুষ কুফর, শির্ক,কুসংস্কার ও জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত ছিল যার কারনে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া সম্ভব হয়নি।প্রাথমিক পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ তার পরিবার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও কাছের বন্ধুবান্ধবদের ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন।তারা সকলেই রাসুলুল্লাহ সাঃ প্রতি ইমান আনায়ন করে কালিমা পাঠ করেছিলো।খাদিজা রাঃ ছিলেন ইসলাম গ্রহনকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি এরপর পর্যায়ক্রমে আবু বক্কর, চাচাতো ভাই আলী, ও পালক পুত্র জায়েদ ইবনু হারিস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্য একটি ঈমানী চেতনা সম্পূর্ণ দলের প্রয়োজন ছিল যারা শত জুলুম ও অত্যাচারের মধ্যেও ইসলাম ত্যাগ করবে না।গোপনে দাওয়াতি কাজ করার মাধ্যমে এক পর্যায়ে অসংখ্য নারী-পুরুষ ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন।এ সময় রাসুলুল্লাহ সাঃ উপর নামাজ ফরজ হলে তিনি তারা সঙ্গী সাথীদের নিয়ে গোপনে ইবাদত করতে থাকেন।এভাবে সময়ের ক্রমে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন রাসুলুল্লাহ সাঃ তাদের একটি বড় ঘর নির্ধারণ করে দিলেন যেখানে তারা আল্লাহর ইবাদত করবে।তারা সকালে সেখানেই জামাতে সহিতে নামাজ আদায় করতেন এবং আল্লাহর রাসূল তাদের দ্বীনি শিক্ষা দিতেন। এভাবে কেটে যায় প্রায় তিন বছর তখন মক্কার কুরাইশদের মধ্যে থেকে অনেকেই ইসলামের ছায়াতলে চলে এসেছেন।তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলামে দাওয়াত দেওয়ার আদেশ প্রেরণ করা হয়।এ বিষয় আল্লাহ সুরা আশ-শুয়ারা ২১৪ নং আয়াত নাজিল করেন।আল্লাহ বলেন______

وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

অর্থঃ এবং তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো। (সূরা আশ শু'আরা, ২৬:২১৪)

আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ আসার পরেই নবীজি সাঃ তা পালনের জন্য বলিয়ান হয়ে ওঠে।তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকেন।তিনি তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন পরকালের হিসাব নিকাশ, জান্নাত জাহান্নাম, আল্লাহর আজব সম্পর্কে জ্ঞাত করেন এবং বললেন তিনি সত্য নবী।কিন্তু সেখানে কেউ তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি হয়নি বরং তারা সকলে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর চরম বিরক্তি প্রাকাশ করে স্থান ত্যাগ করেন।

এভাবে রাসুলুল্লাহ সাঃ দাওয়াতি কাজ পরিচালনা চলমান রেখেছিল।প্রকাশ্যে দাওয়াতি কাজ শুরু করার পর মক্কার মূর্তি পূজারীরা তার বিরুদ্ধে শত্রুতায় লেগে যায়।মক্কার একটি দল আবু তালিবের কাছে এসে নবীজির বিরুদ্ধে নানা কথা বললে তিনি তাদের কৌশলে জবাব দিয়ে বিদায় করেন।মক্কার মানুষ এক পর্যায়ে আবু তালিবকে বলেন আপনি আপনার ভাতিজাকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলুন না হয় উভয়পক্ষের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন একদল সম্পূর্ণরূপে শেষ না হয়ে যায়।এমন গহীন অবস্থা দেখে আবু তালিব চিন্তিত হয়ে পড়েন ও রাসুলুল্লাহ সাঃ এর তার দাওয়াতি কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন।রাসুলুল্লাহ সাঃ যখন আবু তালিবকে ইসলামের মর্মাহত বর্ণনা করেন তখন তিনি এ বলে আস্বস্থ করেন রাসুলুল্লাহ সাঃ পাশে তিনি আছেন।তার সাহায্যের হাত তিনি গুটিয়ে নিবেন না।

দাওয়াত কার্যক্রম চলমান অবস্থায় হজ্বের মৌসুম এসে পড়ে।হজ্বের মৌসুমী বিভিন্ন প্রান্ত হতে হাজীগম আগমন করবেন।রাসুলুল্লাহ সাঃ কাছে ইসলাম প্রচারের জন্য ছিল একটি সুবর্ণ সুযোগ।সে সময় মক্কার কাফিরা ছিলেন চিন্তিত।তারা বিভিন্ন কূটনীতিক কৌশল অবলম্বন করেন যেন আল্লাহর রাসুল ইসলামের প্রাচার না করতে পারেন।হাজীগন মক্কায় আগমন শুরু করলে রাসুলুল্লাহ সাঃ এবং তার সঙ্গী সাথীরা তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। অপরপক্ষে মক্কার কাফিররা হাজীগনদের নিকট রাসুলুল্লাহ সাঃ নামে বিভিন্ন অপবাদ রটনা করেন এই উদ্দেশ্য

যেন তারা ইসলাম গ্রহণ না করেন।কিন্তু তাদের এই এসব কর্মপন্থা হজ্ব করতে আসা লোকদের নবীজির সম্পর্কে জানতে আরো আগ্রহী করে তোলে।

নবীজি এভাবে তার ইসলামের দাওয়াতি কাজ পর্যায়ক্রমে পরিচালনা করে যাচ্ছিলেন এবং তার সাথে সাথে মক্কার কাফিরদের অত্যাচারের পরিমাণও দিনে দিনে বেড়েই চলছিলো।মক্কার কাফেররা নবীজির পিছনে দুষ্ট ছেলেদের লেলিয়ে দিতেন যেন তারা নবীজির বিরুদ্ধে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেন।একদিন রাসূলুল্লাহ সাঃ বাইতুল্লায় নামাজ আদায় রত অবস্থায় ছিলেন ঠিক সে সময়ে আবু জাহেল তাকে আঘাত করার জন্য একটি পাথর নিয়ে আগমন করেন।কিন্তু তিনি যখনই নবীজির নিকট অগ্রসর হন তখনই তার হাত কাপতে লাগলো এবং পাথরটি তার হাত থেকে পড়ে গেলো।তার চেহারা বির্বন আকৃতি ধারণ করে এবং সেস্থান হতে পালিয়ে যায়।তারা আরও নানা ভাবে নবিজী সাঃ নির্মমভাবে অত্যাচার করতে থাকে।তাকে নানান আজেবাজে নামে ডাকতো, ইসলামকে বিকৃতি ভাবে বিভিন্ন লোকদের সামনে উপস্থাপন করা হতো।

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করা শুরু করা হলে মক্কার কুরাইশরা নবীজি সাঃ এর উপর শরীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু করে।ইমান আনায়নকারী মুসলমানদের উপরও পাশবিক নির্যাতন করেন।জুলুম ও নির্যাতনের মাত্রা শুরুতে ছিলো সামান্য যা সময়ের সাথে সাথে শুধু বেড়েই চলেছিলো।এতদিন কুরাইশ কাফিররা শুধু নবীজি সাঃ কে অত্যাচার নির্যাতন করে আসছিলো এবং তিনি তা নিরবে নিভৃতে সহ্য করে যাচ্ছিলেন।কিন্তু যখন মক্কার মুসলমিদের উপর নির্যাতন করা শুরু হয় এবং তার মাত্রা যখন চরম পর্যায়ে চলে গেলে রাসুলুল্লাহ সাঃ তাদের হাবশায় হিজরতের আদেশ করেন।

অবশেষে নবুওয়াতের ৫ম বর্ষের রজব মাসে ১৬ জন সাহাবীর একটি দল আবিসিনিয়ার পথে পাড়ি জমান।

এই দলে ছিলেন ১১ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী।

পুরুষ সাহাবীগণ হলেন-
উসমান ইবনে আফফান রাঃ
আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ
যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাঃ
আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা রাঃ
মুসআব ইবনে উমায়র রাঃ
আবু সালমা ইবনে আব্দুল আসাদ রাঃ
উসমান ইবনে মাযউন রাঃ
আমর ইবনে রাবিয়াহ রাঃ
সুহায়ল ইবনে বায়যা রাঃ
আবু সাবরা ইবনে আবু কহম আমিরী রা
হাতিব ইবনে আমর রাঃ (ইবনে ইসহাক তাঁর নাম উল্লেল্লখ করেন নি, তবে হাফিয ইবনে সায়্যিদুন বাস উদ্ভাৎ করেছেন)
(Iom সিরাহ শীট)

মহিলা সাহাবীগণ হলেন।
ককাইয়া রাঃ (রাসুল সাঃ এর কন্যা এবং উসমান রাঃ এর স্ত্রী)

সাহলা বিনতে সুহায়ল রাঃ (আবু হুযায়ফা রাঃ এর স্ত্রী)

উম্মে সালামা বিনতে আবি উমাইয়্যা (আবু সালামা রাঃ এর স্ত্রী)

লায়লা বিনতে আবু হাসমা রাঃ (আমর ইবনে রাবিয়াহ রাঃ এর স্ত্রী)

উম্মে কুলসুম বিনতে সুহায়ল ইবনে উমর রাঃ (আবু সাবরা রাঃ এর স্ত্রী, ইবনে ইসহাক তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি, তবে হাফিয ইবনে সায়্যিদুন নাস উল্লেখ করেছেন)

ওয়াকিনী রঃ এই দলের মাঝে আব্দুল্লাহ বিনে মাসউদ রাঃ এর নামও উল্লেখ করেছেন। তবে ইবন ইসহাক এবং হাফিয ইবনে হাজার আসকালানি রঃ উভয়েই বলেছেন, আব্দুল্লাহ বিনে মাসউদ রাঃ আবিসিনিয়ায় দ্বিতী হিজরতকারী দলের মাঝে ছিলেন।

১৬ জনের এই দলটি গোপনে মক্কা থেকে রওনা হলেন। তাদের কেউ বাহনে আবার কেউ হেঁটেই রওনা দিলেন। জেদ্দার সমুদ্র বন্দরে গিয়ে তাঁরা দেখলেন সেখানে দুটি জাহাজ আবিসিনিয়া যাওয়ার জন্য নোঙ্গর করে আছে। পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে তারা সাহাবীদের এই দলটিকে জাহাজে তুলে নিলেন। ওদিকে কুরাইশরা খবর পেয়ে সাহাবীদের এই দলটিকে ধরার জন্য রওনা দিল। কিন্তু তারা বন্দরে পৌঁছার পূর্বেই জাহাজ ছেড়ে দিল এবং সাহাবীগণ নিরাপদে আবিসিনিয়া গিয়ে পৌঁছলেন। এই দফায় তাঁরা রজব থেকে শাওয়াল মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

(IOM সিরাহ শীট)

আবু তালিব ও খাদিজা রাঃ মৃত্যু

নবুওয়াতপর দশম বর্ষে আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন।এরপর রমাদান মাসে মৃত্যু বরন করেন রাসুলুল্লাহ সাঃ এর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রাঃ।প্রিয় দুই ব্যক্তির শোকে রাসুলুল্লাহ সাঃ অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়েন।

এ কারণেই নবীজি এ বছরকে আমুল হুজুন বা শোকের বছর বলে অভিহিত করেন।(সিরাতে মুগলতাই:২৬)

নবিজি সাঃ এর তায়েফ গমন

আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার কাফিররা রাসুলুল্লাহ সাঃ উপর অত্যাচারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় এবং গনহারে মানুষ তার ইসলামের দাওয়াত প্রতাখ্যান করতে থাকে।মক্কা মানুষের দ্বারা প্রাপ্ত দুঃখ ও কষ্টে জর্জরিত হয়ে আল্লাহ রাসুল সাঃ নবুওয়াতের দশম বর্ষে বুক ভরা আশা নিয়ে পালক পুত্র জায়েদ বিন হারিশ

কে নিয়ে তায়েফ গমন করে।তায়েফ পৌঁছানোর পর আল্লহর রাসুল দলীয় নেতাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন।কিন্তু তারা সকলেই তা প্রত্যাখ্যান করল।রাসুলুল্লাহ সাঃ দীর্ঘদিন তায়েফের লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেন কিন্তু এটা তাদের দুর্ভাগ্য যে তাদের মধ্যে হতে একজন ব্যক্তিও ইসলাম গ্রহণ করেননি।আল্লাহ রাসুল শেষ পযন্ত ভার আক্রান্ত হৃদয় নিয়ে যখন তায়েফ থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন কিছু দুষ্ট লোক তায়েফের শিশু কিশোর যুবকদের তার পিছনে লেলিয়ে দেয়।তারা রাসুলুল্লাহ সাঃ কে নানা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছিলো এবং ক্রমাগত তার উপর পাথর নিক্ষেপ করে তাকে রক্তাক্ত করেছিলো।দীর্ঘ এত সময় তায়েফে অতিবাহিত করে মক্কায় প্রত্যাবর্তন কালে রাসুলুল্লাহ সাঃ হালত এমন ছিলো যা ভাষায় অপ্রকাশ্য যোগ্য।রাসুলুল্লাহ সাঃ এতটা ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছিল যে রক্ত জমাট বেঁধে পায়ের জুতার সাথে আটকে যায় কিন্তু তারপর তার জবান থেকে তাদের জন্য কোন বদ দোয়া করেননি।

ইসরা ও মিরাজ

একরাতে রাসুলুল্লাহ সাঃ কাবার হাতিমে শায়িত ছিলেন।ঠিক সে সময় জিবরাইল ও মিকাইল আঃ আগমন করেন।তারা রাসুলুল্লাহ সাঃ কে বলেন আমাদের সাথে চলুন।তারা বুরাক নাম একটি বাহন নিয়ে আসেন এবং সেই বাহনে আরোহন করেই আল্লাহ রাসুল বাইতুল মকদিস পযন্ত ভ্রমন করেন এবং সেখানে নামাজ আদায় করেন।এরপর তিনি জান্নাত থেকে নিয়ে আসা প্রবাল ও পদ্মরাগ পাথরের তৈরি সিঁড়ি দিয়ে ঊর্ধ্ব আকাশে ভ্রমন করেন।প্রথম আকাশে আদম আঃ এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয় আকাশে ইয়াহিয়া ও ঈসা আঃ সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এভাবে পর্যায়ক্রমে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত একাধিক নবীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং সর্বশেষ সপ্তম আকাশে ইব্রাহিম আঃ সঙ্গে আল্লাহর রাসূলের সাক্ষাৎ হয়।প্রথম থেকে সপ্তক আকাশ ভ্রমণ কালে আল্লাহর রাসূল জান্নাত ও জাহান্নামের ভ্রমণ করেন এবং সর্বশেষ সপ্তম আকাশে পর সিদরাতুল মুনতাহার দিকে তাশরিক করেন।সিদরাতুল মুনতাহা পর জিবরাইল ফেরেশতার যাওয়ার অনুমতি ছিলো না।এরপরের রাস্তা আল্লাহর রাসুল একাই অতিক্রম করে আল্লাহর সুবহানাওয়া

তালা`র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।সে সময় আল্লাহ তার হাবিব রাসুল সাঃ ও তার উম্মতের উপর ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন।আল্লহর সাথ সাক্ষাৎ এরপর তিনি বুরাকে করে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথ, নবীজি সাঃ এর মদিনায় হিযরত

আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথ এবং নবিজীর মদিনায় হিজরত

আকাবার প্রথম শপথ (বাইয়াতুল আকাবা আল উলা- بيعة العقبة الأولى

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষের হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিবের ৬ জন যুবক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তারা রাসুল সাঃ কে কথা দিয়েছিলেন যে, ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে তারা ইসলাম প্রচার করবেন। পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুয়াতের দ্বাদশ বছরে হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে ১২ জন লোক (খাজরাজ থেকে ১০ জন আর আওস থেকে ২ জন) রাসূলের সাথে দেখা করতে আসেন। এদের মধ্যে পাঁচজন গত বছরেও এসেছিলেন। আর বাকি সাতজন ছিলেন নতুন।

এই লোকগুলো মিনা-র আকাবা নামক স্থানে রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার প্রচারিত দ্বীনের ব্যাপারে কিছু কথা মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। পরবর্তীতে হুদায়বিয়ার চুক্তিপত্র এবং মক্কা বিজয়ের সময় মহিলাদের নিকট থেকে নেওয়া অঙ্গীকারনামায় এই কথাগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অঙ্গীকারনামায় কী কী অন্তর্ভুক্ত ছিল তা 'উবাদা বিন সামিত রাঃ সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, "এসো আমার নিকট এ কথার উপর অঙ্গীকার করো যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার করবে না। চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজ সন্তানকে হত্যা করার না, হাত পায়ের মাঝে মনগড়া কোন অপবাদ আনবে না এবং কোনো ভালো কথায় আমাকে অমান্য করবেন। যারা এসকল কথা মান্য এবং পূর্ণ করবে, আল্লাহর নিকট তাদের

পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু যারা এগুলোর মধ্যে কোনোটি করে বসে এবং তার শাস্তি এখানেই প্রদান করা হয়, তবে সেটা তার মুক্তিলাভের কারণ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ এগুলোর মধ্যে কোনো কিছু করে বসে থাকে এবং আল্লাহ তা গোপন রেখে দেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। চাইলে তিনি শাস্তি দেবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন।"এই বাইয়াতে জিহাদের ব্যাপারে কোন অঙ্গীকার ছিল না। সাধারণত মহিলাগণ ইসলাম গ্রহণের সময় রাসুল সাঃ এর কাছে এসব বিষয়ের অঙ্গীকার করতেন।

হজ্ব সমাপ্ত হয়ে গেলে এই দলটির সাথে রাসূল (সাঃ) প্রথম মক্কা থেকে ধর্মপ্রচারক হিসেবে মুসআব বিন উমায়ের রাঃ (কোন কোন বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাঃ এর নামও এসেছে) প্রেরণ করলেন। মুসআব বিন উমায়ের ইয়াসরিবে গিয়ে আসা'আদ বিন ঘুরারাহ রাঃ এর বাড়িতে আশ্রয় নিলেন এবং তারা দুজনে মিলে প্রবল উদ্যমের সাথে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করলেন।

আকাবার দ্বিতীয় শপথ (বাইয়াতুল আকাবা আস সানিয়াহ بيعة العقبة الثانية

পরের বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের ১৩তম বছরে পুনরায় হজ্বের মৌসুমে ইয়াসরিবের ৪০০ জনেরও অধিক অমুসলিম এবং ৭০ জনেরও অধিক (প্রসিদ্ধ মাতানুযায়ী ৭৫ জন) মুসলিম হাজ্ব পালনের উদেশ্যে মক্কায় আসলেন এবং মুসলিমগণ রাসুল (সাঃ) এর সাথে যোগাযোগ শুরু করলেন। কোন কোন বর্ণনায় মুসআব বিন উমায়ের রাঃ তাঁদেরকে সাথে করে মক্কায় নিয়ে আসেন। সর্বসম্মতিক্রমে ১২ইং জিলহজ্ব তারিখে মিনায় জামরাই আকাবার নিকটে যে সুড়ঙ্গ রয়েছে সেখানে সকলে একত্রিত হলেন এবং সেখানে তারা শপথ গ্রহণ করলেন।

বাইয়াতের দফাসমূহঃ

জাবির রাঃ বলেছেন, আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূলা আমরা আপনার নিকট কোন বিষয়ে শপথ করব?

তিনি বললেন, 'তোমরা যে কথার উপর শপথ করবে, তা হচ্ছেঃ

১। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর কথা শুনবে ও মেনে চলবে।

২। অভাবে ও সচ্ছলতায় একই ধারায় খরচ করবে।

৩। ভালো কাজের জন্য আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে।

৪ । আল্লাহর পথে দণ্ডায়মান থাকবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোনো নিন্দাকারীর নিন্দাকে পরোয়া করবে না।যখন আমি তোমাদের নিকট হিজরত করে যাব, তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং যেমনভাবে আপন জানমাল ও সন্তানদের হেফাজত করছ সেভাবেই আমার হেফাজত করবে। এসব করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।'

কা'ব রাঃ বলেন, রাসূল সাঃ কুরআন তিলাওয়াত করলেন, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত এবং ইসলাম গ্রহণের প্রতি অনুপ্রেরণা দান করে বললেন, 'আমি তোমাদের নিকট এ কথার অঙ্গীকার গ্রহণ করছি যে তোমরা আমাকে ঐ সকল জিনিস থেকে হেফাজত করবে যে সকল জিনিস থেকে তোমরা আপন ছেলে না এবং আত্মীয়-স্বজনদের হেফাজত করে থাকো।' একথা বলার পর বারা বিন মা'রুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কা ধরে বললেন, 'ঐ সত্ত্বার শপথ। যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। সুনিশ্চিত আমরা আপনার ঐ সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজত করব যেসকল অনিষ্ঠ থেকে আমরা আমাদের ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনায় হেফাজত করে থাকি। আপনি আমাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ! আমরা যুদ্ধের স্যা এবং অস্ত্র আমাদের খেলনা। আমাদেরে এই রীতি বাপদাদাদের কাল থেকে চলে আসছে'।
উল্লেখ্য, আকাবার প্রথম বাইয়াত থেকে দ্বিতীয় বাইয়াতের পার্থক্য হল- প্রথম বাইয়াতে শুধুমাত্র শির্ক ও কতিপয় কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার

নেওয়া হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় বাইয়াতে এগুলোর সাথে অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছিল- আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি।

রাসুল (সাঃ) বললেন, 'তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে ১২ জন এমন নেতা নির্বাচন করবে যারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলি সমাধানের ব্যাপারে যথোপযোগী ভূমিকা পালন করবে।' তাঁর ইঙ্গিতে তড়িঘড়ি করে ১২ জন নেতা নির্বাচন করা হলো। ৯ জন খাজরাজ থেকে আর ৩ জন আওস থেকে নির্বাচন করা হলো।

যখন সকল নেতা নির্বাচন সমাপ্ত হলো তখন রাসূল তাদের নিকট থেকে পুনরায় অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, "ঈসা এর পক্ষ থেকে যেভাবে হাওয়ারীগণের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল সেভাবে আজ থাকে আপনাদের উপর আপন আপন সম্প্রদায়ের যিম্মাদারী আপতিত হলো। আর আমার উপর যিম্মাদারী সমগ্র মুসলিম জাতির"। তাঁরা সকলে এক বাক্যে বলে উঠলেন, 'জ্বী হ্যাঁ।'

----
iom সিরাহ শীট

মদিনা হিজরত

আকাবার দ্বিতীয় শপত সম্পাদন হওয়ার কিছুদিন পরে আল্লহর রাসুল সাঃ হাসাবিদের ইয়াসরিবে অর্থাৎ মদিনায় হিজরত করার আদেশ দেন।রাসুলুল্লাহ সাঃ আদেশ ক্রমে হাসাবিরা তাদের পরিবার সহ মক্কায় তাদের বিলাসপূর্ণ বাড়ি উচ্চ মর্যাদা ও বংশের গৌরব সবকিছু ছেড়ে মদিনায় হিজরত করনেন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে তাদের ঈমান রক্ষার তাগিতে।তাদের জানা ছিলো না কি আছে সমানে।

কুরাইশরা যখন আকাবার শপথ সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তারা দারুন নাদওয়ার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলেন রাসুলুল্লাহ সাঃ কে তারা হত্যা

করবেন।রাসুলুল্লাহ সাঃ হত্যা করার পরামর্শটি দিয়েছিলেন আবু জাহেল এবং তারা সেই পরামর্শটি চুড়ান্ত ফায়সালা হিসেবে নির্বাচিত হয়।

এদিকে আল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাঃ মক্কার কাফরদের এই চক্রান্তের কথা জানিয়ে দেন এবং তাকে মদিনায় হিযরতের আদেশ প্রদান করেন।যেদিন নবীজি ও আবু বকর হিজরত করেন ঠিক ঐ রাতেই মক্কার কাফিররা তার ঘরের সামনে সমবেত হন তাকে হত্যা করার জন্য।ঐ রাতে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বিছানায় তার পরিবর্তে আলিকে শোয়ার আদেশ দেওয়া হয় যেন কাফেররা বুঝতে না পারে নবিজী সাঃ ঘরে নেই।রাসুলুল্লাহ সাঃ হিজরতের উদ্দেশ্যে যখন ঘর থেকে বের হন তখন তার দরজার সামনে ছিলো কাফেরদের গোষ্ঠী কিন্তু আল্লাহর কুদরতে একজন লোক ছাড়া আর কেও নবিজী কে দেখতে পাননি।তিনি তাদের চোখের সামনেই হেটে চলে যান হিজরতের উদ্দেশ্যে।অনেক কঠিন পথ অতিক্রম করে রাসুলুল্লাহ সাঃ ও আবু বকর সাওর পাহাড়ে গুহসয় আশ্রয় নেন আর এদিকে মক্কার কাফিররা রাসুলুল্লাহ সাঃ কে ঘরে না পেয়ে যখন বুঝতে পারে তিনি হিজরত করেছে তখন তারা রাগে হন্য হয় তাকে খুজতে থাকে।সাওর পাহাড়ে তারা তিনরাত অবস্থান করেছিলেন এবং প্রতি রাতেই আবু বকর এর ছেলে আব্দুলাহ তাদের সাথে মিলিত হয়ে মক্কার খবরা খবর পৌঁছে দিতেন এবং আবু বকরের মুক্ত কৃতদাস আমের বিন ফুহাইরা সারাদিন সাওর পাহাড়ে ছাগল চড়িয়ে রাতে গুহায় গিয়ে আবু বকর ও রাসুলুল্লাহ সাঃ দুধ পান করাতেন।তিনরাত অতিক্রম হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাঃ ও আবু বকর মদিনা হিজরতের উদ্দেশ্য রাওনা দেন।অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে আল্লাহর হুকুমে তারা মক্কায় গিয়ে পৌছালেন।মক্কায় পৌঁছানোর পরে রাসুলুল্লা সাঃ এর উট বনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লার একটি জায়গায় এসে বসে পড়ে।উট যে স্থানে এসে বসে পরেছিলো তার কাছাকাছি আবু আইয়ুব আনসারির বাড়ি ছিলো।রাসুলুল্লাহ সাঃ প্রথমে সেই আনসারির বাড়িতে ছিলেন এবং পরবর্তীতে তার জন্য ঘর নির্মাণ করা হয় ঐ স্থানটিতে যেখানে তার উট এসে বসে পড়েছিলো। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর হিজরতের কিছুদিন পর তার পরিবারের অন্য সদস্যরাও মদিমায় চলে আসেন এবং আবু বকরের পরিবার পরিজনও মক্কায় হিজরত করে।

বদর যুদ্ধের ঘটনাবলী

গাজওয়ায়ে বদর বা বদরযুদ্ধ

মদিনা থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরের একটি কূপের নাম বদর। এই কূপের নামে সেখানে একটি গ্রামও রয়েছে। তখনকার দিনে সেখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির বেশ গুরুত্ব ছিল। এখানেই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সম্মুখযুদ্ধ হয়।মদিনায় বইতে থাকা কাফিরদের বেশ ভাবিয়ে তুলছিল-না জানি কখন তা দমকা হাওয়ায় রূপ নিয়ে তাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়; কিংবা তাদের ব্যবসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মুসলিমদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে তারা সর্বদা সচেষ্ট থাকত। মোটকথা, তাদের গর্ব, অহংকার এবং শক্তির উৎস ছিল শামে তাদের ব্যবসাবাণিজ্য। বিষয়টি মসলিমরাও আঁচ করতে পেরেছিলেন। ফলে মুসলিমদের জন্য রাজনীতি ও কৌশল হিসেবে কুরাইশদের শক্তির এই উৎস বন্ধ করা জরুরি ছিল।

এ সময় অর্থসংগ্রহ ও যুদ্ধসরঞ্জাম কেনার উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার এক বিশাল বাণিজ্যকাফেলা শামে গিয়েছিল। কুরাইশদের এই বাণিজ্যকাফেলা যখন শাম থেকে ব্যবসা শেষে অস্ত্র নিয়ে ঘরে ফিরছিল, তখন নবিজি এ সম্পর্কে জানতে পেরে দ্বিতীয় হিজরির **১২** রমজান **৩১৪** জন মুহাজির ও আনসার সাহাবিকে নিয়ে তাদের মোকাবিলায় বেরিয়ে পড়েন। রাওহা নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁরা সেখানে শিবির স্থাপন করেন। কেননা, মুসলিমবাহিনীর কাছে তখন আত্মরক্ষার্থে হামলা করা

ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। বিষয়টি আবু সুফিয়ান টের পেয়ে রাস্থা পরিবর্তন করে সমুদ্রের উপকূল ধরে কাফেলা নিয়ে এগিয়ে যান। পাশাপাশি তিনি এক অশ্বরোতীকে দ্রুত মক্কার কুরাইশদের কাছে এটা জানাতে পাঠিয়ে দেন যে, কুরাইশরা যেন নিজেদের পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে এবং কাফেলাকে বিপদমুক্ত করে।

এদিকে কুরাইশরা আগ থেকেই মুসলিমদের মূলোৎপাটন করতে বিভিন্ন বাহানা খুঁজছিল। ফলে সংবাদটি জানার সঙ্গে সঙ্গে আবু জাহলের নেতৃত্বে **৯৫০** জন সশয়

যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী মদিনা আক্রমণের জন্য বের হয়। তাদের সঙ্গে ১০০ ঘোড়া এবং ৭০০ উটও ছিল। এ বাহিনীতে কুরাইশের বড় বড় সকল নেতা অংশ নেয়।

রাসুল সাঃ এ বিষয়ে অবগত হলে তিনি সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এ সময় আবু বকর ও অন্যান্য সাহাবি নিজেদের জানমাল নবিজির খিদমতে সঁপে দেন। অল্পবয়সি হওয়ায় উমায়ের ইবন ওয়াক্কাসকে যুদ্ধ অংশ নেওয়া থেকে বারণ করলে তিনি কান্না শুরু করেন। ফলে নবিজি তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন।

এদিকে আনসারদের থেকে খাজরাজের সরদার সাআদ ইবনু উবাদা রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'আল্লাহর কসম, আপনি নির্দেশ দিলে আমরা সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।' এ ছাড়া সহিহ বুখারির বর্ণনায় রয়েছে, তখন মিকদাদ রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার ডানে-বামে, সামনে-পেছনে সব দিক থেকে লড়াই করে যাব।'

রাসুল তাঁদের এসব কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং সামনে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। এরপর সবাই ঐতিহাসিক বদর-প্রান্তরের সন্নিকটে পৌঁছে জানতে পারেন, আবু সুফিয়ান তাঁর বাণিজ্যকাফেলা নিয়ে এখান থেকে অন্যদিকে চলে গেছেন এবং কুরাইশেরই একটি বিশাল সেনাবাহিনী মাঠের অন্য প্রান্তে শিবির স্থাপন করেছে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যকাফেলা নিরাপদে চলে যাওয়ার পরও আবু জাহল তার লোকজনকে যুদ্ধ স্থগিত না করতে কুপরামর্শ দেয়।মুসলিমরা তাদের এমন মনোভাব বুঝতে পেরে সামনে অগ্রসর হন এবং দেখতে পান, কুরাইশবাহিনী ময়দানের এমন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে, যেটি যুদ্ধের জন্য বেশ উপযুক্ত। কেননা, পানির উৎসগুলো সেখানেই ছিল। আর মুসলিমবাহিনী ময়দানের এমন জায়গায় অবস্থান নেয়, যেটি শুল্ক আর বালুকাময়। এখানে চলাফেরা করাও এঠিন। এ ছাড়া পানিরও কোনো নামগন্ধ ছিল না।

গায়েবি সাহায্য

আল্লাহ তাআলা মুসলিমবাহিনীর জন্য বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি সেভাবেই সবকিছু ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের আগের দিন বৃষ্টি হয়, ফলে বৃষ্টির পানিতে বালু জমে শক্ত হয়ে যায়। মুসলিম সেনারা তখন তৃপ্তিভরে পানি পান করেন এবং নিজ নিজ পাত্রগুলোতে পানি ভরে রাখেন। অন্যদিকে এই বৃষ্টি কাফিরদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। তারা যেখানে অবস্থান করছিল, সে জায়গায় বৃষ্টির পানিতে কাদা জমে পিচ্ছিল হয়ে যায়। হাঁটাচলা করাও তাদের জন্য কষ্টক।

দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজান শুক্রবার উভয় পক্ষ চূড়ান্ত যুদ্ধে নাজিল হয়। নবিজি সেনাদের কাতার ঠিক করতে নিজেই দাঁড়িয়ে যান। ফলে মুসলিমবাহিনী সুরু প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে যায়।

মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা

মাত্র ৩০০ নিরস্থছ মুসলিম সেনা যখন প্রায় ১ হাজার অস্ত্রসজ্জিত সেনার মোকাবিলা করছে, এ সময় যদি মাত্র একজন লোকও তাঁদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে, তাহলে সেটা অত্যন্ত উপকারী মনে করা হবে। তবে ইসলামে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এমন কঠিন মুহূর্তে পাওয়া সাহায্য থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে যখন উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে, তখন হুজায়ফা ও আবু হাসানা বা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রণাঙ্গণে এসে উপস্থিত হন। এ সময় তাঁরা রাস্তায় ঘটে যাওয়া ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'কাফিররা রাস্তায় আমাদের আটক করেছিল। তখন তারা আমাদের জিজ্ঞেস করে, "তোমরা কি মুহাম্মাদকে সাহায্য করতে যাচ্ছ?' আমরা তা অস্বীকার করি এবং যুদ্ধে অংশ নেব না বলে প্রতিশ্রুতি দিই।' নবিজি যখন তাঁদের এমন প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে তাঁদের বিরত রাখেন এবং বলেন, 'আমরা সর্ব্যবস্থায় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট।(সহিহ মুসলিম)

এরপর মুসলিম সেনাদের কাতার সোজা করা হলে তখনকার রীতি অনুযায়ী দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যমে লড়াই শুরু হয়। কুরাইশদের থেকে তিনজন বীর-উতবা ইবনু

রাবিআ,শায়বা ইবনু রাবি ও ওয়ালিদ ইবনু উতবা লড়াইয়ের জন্য সামনে আসে, আর মুসলিমদের থেকে হামজা ইবনু আবদুল মুত্তালিব, উবায়দা ইবনু হারিস ও আলি ইবনু আবি তালিক রা তাদের মোকাবিলা করেন। কুরাইশের পক্ষের তিনজনই নিহত হয়। মুসলিমদের শুধু উবায়দা রা আহত হন। আলি রা. তখন তাঁকে কাঁধে করে নবিজির কাছে নিতে আসেন। নাবিজি তাঁকে নিজের উরুতে শুইয়ে দিয়ে তাঁর চেহারা থেকে ধুলোবালি নিজ হাতে পরিষ্কার করে দেন। এ সম্পর্কে কবি বলেন,

বন্ধু আমার আঁচল দিয়ে মুছে দিচ্ছেন অশ্রু আজকের কান্নায় তাই আছে আনন্দের কারণ।

উবায়দা রাঃ শাহাদাত-মুহূর্তে নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমি কি শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম?' নবিজি বলেন, 'না, তুমি নিশ্চয় শহিদ এবং আমি নিজেই এর সাক্ষী।' নবিজির মুখে এ কথা শুনে উবায়দা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলতে থাকেন, 'আজ যদি আবু তালিব বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাঁকে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হতো যে, আমিই হলাম তাঁর কবিতার উপযুক্ত ব্যক্তি।

এরপর উবায়দা রা. ইনতিকাল করলে খোদ রাসুল তাঁর কবারে নামেন এবং নিজ হাতে তাঁকে দাফন করেন। সাহাবিদের মধ্যে বিশেষ এই মর্যাদা কেবল উবায়দা রা.-এর ভাগ্যেই জুটেছিল।(কানজুল উম্মাল)

আবু জাহলকে হত্যা

আর আবু জাহলের অপকর্ম এবং ইসলামের বিরদ্ধে তার শত্রুতা সম্পর্কে সবাই জানতেন, ফলে আনসারদের মধ্যে কিশোর মুআজ ও মুআওয়িজ নামের দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাঁরা যখনই তাকে দেখবেন, তখনই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করবেন অথবা নিজেরা শহিদ হয়ে যাবেন।

বদরের যুদ্ধকে সুযোগ মনে করে নিজেদের প্রতিজ্ঞা পুরণ করতে দুই ভাই বের হন, কিন্তু তাঁরা আবু জাহলকে কখনো দেখেননি, তাই তাকে চিনতেন না। তাঁরা আবদুর রহমান ইবন আউফকে জিজ্ঞেস করেন, 'আবু জাহল লোকটা কে?' আবদুর রাহমান ইবন আউফ রা. তখন ইশারায় তাকে দেখিয়ে দেন। আবু জাহলকে দেখামাত্রই তাঁরা বাজপাখির মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই কাফির সরদার আবু জাহল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।এ সময় আবু জাহলের পাশেই যুদ্ধ করছিলেন তার ছেলে ইকরিমা। তিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি পিতার এই করুণ দশা দেখে প্রথমে ভড়কে যান। এরপর পেছন দিক থেকে এসে মুআজ রা.-এর বাহুতে তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করেন। ফলে তাঁর হাতটি কেটে যায় এবং শরীর থেকে আলাদা হয়ে চামড়ার সামান্য অংশে ঝুলে থাকে। এ অবস্থায়ই তিনি ইকরিমার পিছু ধাওয়া করেন; কিন্তু ইকরিমা দৌড়ে পালিয়ে যান।মুআজ রা.-এর কর্তিত হাতটি তখনো ঝুলে ছিল এবং এতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছিল, এ জন্য তিনি সে হাতটি পায়ের নিচে রেখে এক টানে ছিঁড়ে ফেলেন। তারপর ছিড়ে ফেলা হাত দূরে নিক্ষেপ করে আবারও যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন।(সিরাতে হালবিয়া ১/৫৫৪)

একমঠো পাথরকণা দিয়ে শত্রুদের পরাজিত করা এবং ফেরেশতাদের সাহায্য

আল্লাহ তাআলার আদেশে রাসূল সা একমুঠো মাটি বা পাথর নিয়ে শত্রুদের প্রতি ছুড়ে মারেন এবং সাহাবিদের নির্দেশ দেন, 'একযোগে তোমরা তাদের ওপর হামলা চালাও।'এদিকে রাসুলের নিক্ষিপ্ত পাথর তাদের সবার চোখে বিদ্ধ হয়।নবিজির নির্দেশ পেয়েই সাহাবিদের ছোট এই বাহিনী কাফিরদের দিকে এগিয়ে যায়। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন।

এ যুদ্ধে কুরাইশদের বড় বড় অনেক নেতা নিহত হয়। এতে করে মুশরিক সেনাদের মনোবল ভেঙে যায় এবং পরাজিত হয়ে তারা যুদ্ধের মাঠ থেকে পালায়। মুসলিমরা তখন শত্রুবাহিনীর পিছু ধাওয়া করে অনেককে হত্যা এবং অনেককে বন্দি করেন।

এভাবে কাফিরদের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দি হয়। নিহতের মধ্যে কুরাইশের নেতা আবু জাহল, উমাইয়া ইবনু খালফ, শায়বা ইবনু রাবিআ, তার ভাই উতবা এবং তার ছেলে ওয়ালিদ ইবনু উতবা ছিল। অপরদিকে মুসলিমদের মধ্যে মাত্র ১৪ জ। শহিদ হন। তাঁদের মধ্যে ছয়জন মুহাজির ও আটজন আনসার সাহাবি ছিলেন।

উল্লেখ্য, এ যুদ্ধ বা গাজওয়া মূলত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে প্রকাশ্য একটি মুজিজা। এমন না হলে এই অসীম যুদ্ধে অল্পসংখ্যক মুসলিমবাহিনীর বিজয়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। মাত্র ৩১৪ জন নিরস্ত্র মুসলমানের মোকাবিলায় কুরাইশের ১ হাজার সশস্ত্র সেনার বিশাল বাহিনীর পরাজয় বিস্ময়ের অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কেননা, বিপক্ষদলে নেতৃস্থানীয় বিত্তশালী এমন অনেক লোক ছিল, যাদের।একেকজন পুরো বাহিনীর খাবার ও অন্যান্য খরচ বহনের সক্ষমতা রাখত। আর তাদের মোকাবিলায় ছিল অস্ত্র ও সহায়-সম্বলহীন সামান্য কিছু মুসলমান। এদিকে কাফিরবাহিনীতে ছিল ১০০ অশ্বারোহী; আর মুসলিমবাহিনীতে ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া। কুরাইশদের কাছে ছিল বিশাল অস্ত্রভান্ডার; আর মুসলিমবাহিনীতে হাতেগোনা কয়েকটি তরবারি।এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে যেসব বিষয় প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছিল, তা ছিল নাখলার খণ্ডযুদ্ধ, কাফিরদের রণপ্রস্তুতি, আবু সুফিয়ানের অপপ্রচার, যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য ওহি লাভ, মক্কাবাসীর ক্ষোভ ইত্যাদি।

এ ছাড়া বদরযুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর বিজয় কুরাইশদের অবাধ বাণিজ্য এবং আরবের অন্যান্য গোত্রের ওপর অন্যায় প্রভাব খাটানোর পথ বন্ধ করে দেয়। মদিনার উপকণ্ঠে ডাকাতি ও লুণ্ঠনের যে ধারা যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল, যার পেছনে কুরাইশ-নেতাদের সহযোগিতা ও প্রশ্রয় ছিল, তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মুসলিমবাহিনীর এই বিজয়ে স্বস্তি প্রকাশ করে মদিনা ও আশপাশে সবস্তরের মানুষ। তারা স্বাগত জানায় সত্যপক্ষের এই মহান বিজয়কে।

সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া

উহুদ যুদ্ধ ,খন্দক যুদ্ধ

মক্কার কুরাইশরা বদর যুদ্ধের পরাজয় ও গোত্রীয় প্রধানদের মৃত্যুর শোকে ক্রোধে বর্ধিত হয়ে মুসলমানদের উপর পুনরায় যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন।এটি উহূদ যুদ্ধের মূল প্রেক্ষাপট।

উহুদ যুদ্ধে বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে মক্কার কাফিররা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহন করা।অসংখ্য ঘোড়া,উট,লোহ বর্ম এবং সেনাবাহিনীর সেবার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয় একাধিক দাসী। উহুদ যুদ্ধে সেনাদের প্রধান ছিলেন আবু সুফিয়ান।

তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদিনার দিকে চলতে থাকে।কুরাইশ বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা শুরু করলে মক্কায় থাকা আব্বাস আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং সার্বিক বিষয় জানিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর কাছে একজন বার্তাবাহক পেরন করেন।রাসুলুল্লাহ সাঃ যুদ্ধের বিষয়ে অবগত হয়ে যুদ্ধ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দেন।১৪ সাওয়াল শুক্রবার যুদ্ধ যাত্রা শুরু করা হয়।অনেক বাধা অতিক্রম করে রাসুলুল্লাহ সাঃ উহুদ পাড়ার ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নেন।

যুদ্ধের জন্য মুশরিক ও মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হলে মুশফিকদের পতাকা তালহা ইবনু আবি তালহা হাতে নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেন এবং মুশরিকদের মধ্যেই তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বীর যোদ্ধা।এভাবে মুশরিক ও মুসলিমের মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে এবং শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাতিলের বিরুদ্ধে।মুসলিম অত্যন্ত বীরত্ব এবং বিচক্ষণতার সাথে যুদ্ধ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে মুশরিক বাহিনীর পরাজয় স্পষ্ট হয়ে উঠে।তারা তাদের মনোবল হারিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করতে থাকে এবং এরই মাধ্যমে উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় অর্জন করে।

খন্দক যুদ্ধ

মদিনা মদিনা থেকে কোন নাযির নির্বাসিত হওয়ার পর তারা মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে থাকে।মক্কার কুরাইশদেরও উসকানি

দিয়ে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।তারা ভিন্ন গোত্রের মানুষদের একত্রিত এক বিশাল ধন্যবাদ বাহিনী নিয়ে দিনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।রাসুলুল্লাহ সাঃ যখন তাদের এই পরিকল্পনার সম্পর্কে অবগত হলে তিনি মদিনার শিশু ও নারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন এবং যুদ্ধের পরিকল্পনার জন্য সাহাবীদের সঙ্গে একটি পরামর্শ সভা ডাকেন।সালমান ফারসি মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ না করে বরং মদিনার ভিতরে পরিখা খননের পরামর্শ দেন যেন শত্রু বাহিনী মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে।সালমান ফারসির পরামর্শে মদিনার পরিখা খনন করা হয় যে স্থানে যেখান দিয়ে শত্রবাহিনী বাহিনী মদিনায় প্রবেশ করার আশঙ্কা আছে।এদিকে কাছের বাহিনী মদিনা অবরোধ করে রাখে।এভাবে প্রায় ১৫ দিন কেটে যায় এবং সাহাবীরা ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পরে।অবরোধের একপর্যায়ে উভয় পক্ষের পাথর ও তীর বর্ষণ শুরু হয় এবং ঐদিন অবস্থা এতটাই নিম্ন পর্যায়ে চলে যায় যে রাসুলুল্লাহ সাঃ ও সাহাবিদের ৪ ওয়াক্ত নামাজ কাজা করতে হয়।একপর্যায়ে পক্ষ থেকে সাহায্য আসে।কাফেরদের উপর এমন ঝড় বয়ে যায় যে তাদের সব কিছু লন্ডনভন্ড করে দেয় এবং অনেক কিছুই উড়িয়ে নিয়ে যায়।এই ঘটনার পর তাদের খাদ্য সামগ্রীও শেষ হয়ে আসে এবং একপর্যায়ে তাদের দল নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য এবং বিভেদের কারণে একপর্যায়ে তারা পলায়ন করে।এভাবে মুসলিম বাহিনী খণ্ডক যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন।

বিজয় লাভ করার পর ষষ্ঠ হিজরীতে বিভিন্ন আরও কিছু যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসুলুল্লাহ সাঃ স্বপ্নে দেখলেন তিনি এবং তার সাহাবীগন বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছে।এই স্বপ্ন দেখার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিলে তিনি উমরা করতে মক্কায় যাবেন এবং এই সাহাবীগনও উমরার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন।অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাঃ এবং সাহাবিরা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওনা হয়।হুদায়বিয়া নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করা হয়।রাসুলুল্লাহ সাঃ মক্কার কুরাইশদের জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি উমরা পালন করতে মক্কায় এসেছেন যুদ্ধ করা তাদের উদ্দেশ্য নয়।কিন্তু মক্কার কুরাইশরা যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাচ্ছিলেন। তারা কিছুতেই মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না।অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাঃ সন্ধিঃ প্রস্তাব সহিতে উসমান রাঃ কে মক্কার কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করেন।

অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধিঃ চুক্তি স্থাপন হয়।

চুক্তির দফা সমূহ -

১। রাসূল সাঃ এবছর মক্কায় প্রবেশ না করে সাহাবীগণকে নিয়ে মদিনায় ফিরে যাবেন। মুসলিমগণ আগামী বছর মক্কায় আসবেন এবং তিন দিন অবস্থান করবেন। তাদের সাথে সফরের প্রয়োজনীয় অস্ত্র থাকবে এবং তরবারি কোষবদ্ধ থাকবে। তাদের আগমনে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না।

১। দশ বছর পর্যন্ত দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এ সময় লোকজন নিরাপদ থাকবে, কেউ কারও উপর হাত উত্তোলন করবে না।

৩। যেসকল গোত্র কিংবা জনগোষ্ঠী মুহাম্মদের অংশে প্রবেশ করতে চায়, সে প্রবেশ করতে পারবে। যে গোত্র যে দলে অংশগ্রহণ করবে তাকে সেই দলের অংশ মনে করা হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন গোত্রের উপর অন্যায়, অত্যাচার করা হলে সংশ্লিষ্ট দলের উপর অন্যায় করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।

৪। কুরাইশদের কোন লোক অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া পালিয়ে গিয়ে মুহাম্মদের দলে যোগদান করলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে। কিন্তু মুহাম্মদের আওতাভুক্ত কোন লোক আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে পালিয়ে গিয়ে কুরাইশদের নিকটে গেলে কুরাইশগণ তাকে ফেরত দেবে না।

চুক্তি সম্পাদক করে রাসুলুল্লাহ সাঃ ও সাহাবিগন পশু কোরবানি করে মাথা মুন্ডন করেন এবং তাদের সকল প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদক করে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।(IOM সিরাহ শীট)

হুদায়বিয়া চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পর খাইবার যুদ্ধ ও মুতাহার যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো।মুসলমানরা সেসব যুদ্ধেও বিজয় অর্জন করেন।

মক্কা বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে যেসব শর্ত লেখা ছিল, মুসলিমরা তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেগুলো পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করছিলেন। অষ্টম হিজরিতে কুরাইশরা সেই সন্ধি ভঙ্গ করে বসে। রাসুল ঐ একজন দূত পাঠিয়ে চুক্তিনামা নবায়নের জন্য কুরাইশদের সামনে তখন কয়েকটি শর্ত দেন এবং শেষের ছকে লিখে দেন যে, এ শর্তগুলো তাদের মনঃপুত না হলে হুদায়বিয়ার সন্ধি ভেঙে গেছে ভাল মনে করতে হবে। ফলে কুরাইশরা সন্ধিভঙ্গের প্রস্তাবই গ্রহণ করে।

এরপর রাসুল যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং অষ্টম হিজরির ১০ রমজান মঙ্গলবার আসরের নামাজের পর ১০ হাজার সাহাবির বিশাল এক বাহিনী সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন। তারপর 'কুদায়বিয়া' নামক স্থানে মাগরিবের সময় হলে সবাই সেখানে ইফতার করেন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে মুসলিমবাহিনীর একটি অংশসহ উপর দিকের রাস্তা দিয়ে মক্কায় প্রবেশের জন্য পাঠান। তাঁদের এটাও বলে দেন যে, 'কেউ তোমাদের সঙ্গে সংঘর্ষে না জড়ালে তোমরাও তরবারি উন্মুক্ত করবে না।'

এদিকে রাসুল নিজে অপর প্রান্ত দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং সাধারণ ঘোষণা দেন-'যে মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে-ও নিরাপদ। যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে-ও নিরাপদ।' অবশ্য তিনি ১১ জন পুরুষ আর চারজন মহিলার রক্ত ক্ষমা করেননি। কারণ, তাদের অস্তিত্বই ছিল যাবতীয় বিশৃঙ্খলার মূল। কিন্তু তারা সবাই এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। পরে তাদের অধিকাংশই মক্কাবিজয়ের পর মদিনায় পৌঁছে ইসলামগ্রহণ করে।

২০ রমজান শুক্রবার রাসুল সাঃ তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। তখন পর্যন্ত কাবার আশপাশে ৩৬০টি মূর্তি যথারীতি বিদ্যমান ছিল। এ সময় নবিজির হাতে একটি কাঠের টুকরো ছিল। তিনি যখন একটি মূর্তির পাশ দিয়ে যেতেন, তখনই কাঠ দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করতেন আর মূর্তিটি মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। তখন তাঁর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল।

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই। [সুরা বনি ইসরাইল: ৮১)

____

সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া

তাওয়াফ সমাপ্ত করে রাসুল কাবার চাবিরক্ষক উসমান ইবনু তালহা শাইবির কাছ থেকে কাবার চাবি নিয়ে কাবার ভেতরে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে মাকামে ইবরাহিমে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তিনি মসজিদে তাশরিফ নেন।এদিকে লোকজন গভীর উৎকণ্ঠায় এ অপেক্ষা করছিল যে, রাসুল কুরাইশদের ব্যাপারে আজ কী নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু সব দ্বিধা, সংশয় আর উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বনবি কুরাইশদের সম্বোধন করে বলেন, 'তোমারা সব দিক

থেকে স্বাধীন ও নিরাপদ!' তারপর তিনি কাবাঘরের চাবিও তাদের হাতে ফেরত দিয়ে দেন।(তালখিসুস সিরাত)

মক্কা বিজয়ের পর অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন।তাদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ ছিলো যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ঈমান এনেছিল কিন্তু মক্কার কাফিরদের ভয়ে তারা চুপ ছিলো এবং মক্কা বিজয়ের পর তারা আত্মপ্রকাশ করেন।

মক্কা বিজয়ের পরও রাসুলুল্লাহ সাঃ হুনাইয়েন যুদ্ধ,তায়েফ অবরোধ,তাবুক যুদ্ধসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে।

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ইন্তেকাল

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বিভিন্ন কথা ও আচার-আচরণের মাধ্যেমে ক্রমশই এ বিষয়টি প্রকাশ হতে থাকে আল্লাহ রাসূলের অস্থায়ী এ জীবন থেকে বিদায় নেওয়া সময় হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহর রাসূল সর্বদা দশ দিন ইত্তিকাফ করতেন কিন্তু তার জীবন দশার শেষ রমাদানে তিনি ২০ দিন ইত্তিকাফ করেন এবং সেই বছর জিবরাইল আঃ তাকে দুইবার কোরআন তিলাওয়াত করে শুনান।

একাদশ হিজরি ২৯ সফর সোমবার দিন রাসুলুল্লাহ সাঃ জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে কবর বাসীদের জন্য দোয়া করেন এবং সেখানে থেকে আসার পরই শুরু হয় তার অসুস্থতা যা ক্রমশই বৃদ্ধি হতে থাকে।রাসুলুল্লাহ সাঃ একপর্যায়ে এতটা অসুস্থ হয়ে যান যে তার পরিবর্তে আবু বকর কে নামাজের ইমামতি করার আদেশ দেন।রাসুলুল্লাহ সাঃ অসুস্থতা বেড়ে গেলে তিনি আয়েশা রাঃ ঘরে থাকার ইচ্ছে পোষণ করেন এবং এ বিষয়ে তার সকল স্ত্রী থেকে অনুমতি নেন।সোমবার দিন ফজর নামাজে আবু বকরের ইমামতিতে সাহাবারা যখন নামাজরত অবস্থায় ছিলেন তখন রাসুলুল্লাহ সাঃ আয়েশা রাঃ এর ঘরের পর্দা সরিয়ে তাদের নিকট দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।আবু বকর এ অবস্থা বুঝতে পেরে নামাজের কাতারের দিকে সরে আসছিলেন কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাঃ ইশারায় তাকে নামাজ শেষ করতে বলেন।ঐদিন রাসুলুল্লাহ সাঃ আপন কন্যা ফাতিমা, জামাতা আলী ও প্রিয় হাসান হোসাইন এর

সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সহাবাদের কল্যানকর নসিহা করেন।সময়ের সাথে সাথে রাসুলুল্লাহ সাঃ যন্ত্রণা বৃদ্ধি হতে থাকে এবং চুড়ান্ত মৃত্য যন্ত্রণার একপর্যায়ে তার রুহ এই নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে।এ পৃথিবীর বুক থেকে তিনি চির বিদায় নিয়ে চলে যান, এই দিনটি ছিল **১১** ই হিজরী **১২**ই রবিউল আউয়াল সোমবার সূর্য হেলে যাওয়া ঠিক পরেই এ সময় তার বয়স হয়েছিল **৬৩** বছর ৪ দিন।